দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

৬৮ বর্ষ, ৪৪ সংখ্যা।। ১৮ জুলাই ২০১৬।। ২ শ্রাবণ - ১৪২৩।। যুগাব্দ ৫১১৮।। website : www.eswastika.com ।।

আইসিস
জেহাদিদের সন্ত্রাসে
বিশ্ব আজ আতঙ্কিত

—পৃঃ ...১২

বাংলাদেশ নয়,
ইসলামিক জল্লাদদের
মূল লক্ষ্য ভারত

—পৃঃ ...২৯

ইসলামি জেহাদ

বিশ্ব সন্ত্রাস

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত
বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৮ বর্ষ ৪৪ সংখ্যা, ২ শ্রাবণ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ

১৮ জুলাই - ২০১৬, যুগাব্দ - ৫১১৮,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য, সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন □ ৬-১০

ভারতীয় মুসলমানদের প্রমাণ করার এটাই উপযুক্ত সময় যে তারা সবাই জেহাদি নয় □ গূঢ়পুরুষ □ ১১

আইসিস জেহাদিদের সন্ত্রাসে বিশ্ব আজ আতঙ্কিত □ মেঃ জেঃ কে কে গঙ্গোপাধ্যায় (অবঃ) □ ১২

সন্ত্রাসবাদীদের ধর্ম আছে এবং তা ইসলাম □ অমলেশ মিশ্র □ ১৪

সন্ত্রাসে আক্রান্ত আমেরিকার অবস্থা চৌমাথার মোড়ে দাঁড়ানো দিশেহারা পথিকের মতো □ সন্দীপ চক্রবর্তী □ ১৬

ফ্লোরিডা থেকে বাংলাদেশ : ইসলামি সন্ত্রাসের পদচারণা □ বিমলকৃষ্ণ দাস □ ১৮

শ্রীগুরু পূর্ণিমা □ ড. ইন্দ্রজিৎ সরকার □ ২১

যাবতীয় সমস্যার সমাধান কিন্তু হিন্দু-মুসলমান বাকযুদ্ধের মধ্যে পাওয়া যাবে না □ তনবীর আলম □ ২৭

শিয়রে শমন — বাংলাদেশ নয়, ইসলামিক জল্লাদদের মূল লক্ষ্য ভারত □ সাধন কুমার পাল □ ২৯

অপারেশন সদ্‌ভাবনা— কাশ্মীরে ভারতীয় সেনার জনকল্যাণমুখী প্রকল্প □ ৩২

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ □ **নবাঙ্কুর : ২৪-২৫** □ **অঙ্গনা : ২৬** □ **অন্যরকম : ৩৩** □ **সুস্বাস্থ্য: ৩৫** □ **সমাবেশ-সমাচার : ৩৬-৩৭** □ **রঙ্গম : ৩৯** □ **শব্দরূপ : ৪০** □ **চিত্রকথা : ৪১** □ **প্রাসঙ্গিকী : ৪২**

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ২৫ জুলাই, '১৬

প্রকাশিত হবে ২৫ জুলাই, '১৬

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

'গীতা রহস্য'-এ জাতীয়তা

লোকমান্য তিলকের 'গীতা রহস্য' গ্রন্থের দেড়শো বছর অতিক্রান্ত হলো। তিলক জাতীয়তাকে আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। জাতীয়তা নিয়ে সাম্প্রতিক বিতর্কে তাই একবার ফিরে দেখা— গীতারহস্যে জাতীয়তা। লিখেছেন ড. ইন্দ্রজিৎ সরকার।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,

মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®

সর্ষে পাউডার

SUNRISE PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

অশান্ত কাশ্মীর

কাশ্মীর আবার উত্তাল, অগ্নিগর্ভ। ১৯৯০-এর দশকের প্রথম দিকের পর এত বড় বিক্ষোভ কাশ্মীরে হয় নাই। যদিও ভারতের নামে মুর্দাবাদ ধ্বনি, জাতীয় পতাকাকে অসম্মান, নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানদের লক্ষ্য করিয়া পাথর ছোঁড়া—গত কয়েক দশক ধরিয়া কাশ্মীরের এই চিত্র। গত সপ্তাহে হিজবুল মুজাহিদিন জঙ্গি নেতা বুরহান মুজফফর ওয়ানির মৃত্যুতে শুরু হইয়াছে ব্যাপক বিক্ষোভ ও হিংসাত্মক ঘটনা, বিশেষত দক্ষিণ কাশ্মীরের অনন্তনাগ ও কুলগাঁও জেলায়। দক্ষিণ কাশ্মীরে—শ্রীনগর হইতে জম্মু সংযোগকারী অতি গুরুত্বপূর্ণ হাইওয়ে সংলগ্ন অঞ্চল আগে এত বিক্ষোভ-প্রবণ ছিল না। এইবার বিক্ষোভ ও সংঘর্ষের অন্যতম কেন্দ্রই হইল দক্ষিণ কাশ্মীর, মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতির নিজস্ব অঞ্চল। বিক্ষোভকারীরা কাশ্মীরের বিভিন্ন পুলিশ থানা, নিরাপত্তারক্ষীদের উপর হামলা চালাইতেছে। বিভিন্ন এলাকায় নিরাপত্তা রক্ষীদের লক্ষ্য করিয়া বিক্ষোভকারীরা পাথর ছুঁড়িতেছে। বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনগুলির ডাকা হরতাল ও কার্ফুর জেরে উপত্যকার জনজীবন কার্যত স্তব্ধ। নিরাপত্তা রক্ষীদের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষে নিহতের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৩২ জনে। হিংসা ও অশান্তির জেরে অমরনাথ যাত্রা স্থগিত রাখা হইয়াছে। মোবাইল-ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ। যাহার মৃত্যুকে কেন্দ্র করিয়া কাশ্মীর উপত্যকা এখন উত্তাল, সেই 'মোস্ট ওয়ান্টেড' হিজবুলের পোস্টার বয় হিসাবে পরিচিত ২১ বছর বয়সী বুরহান ওয়ানির মাথার দাম ছিল দশ লক্ষ টাকা। কাশ্মীরে সেনা কলোনি তৈরি ও কাশ্মীরি পণ্ডিতদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হইলে রক্ত ঝরানোর হুমকি দিয়াছিল সে। এই বছরের অমরনাথ যাত্রীদেরও সে নিশানা করিয়াছিল। লক্ষণীয়, যুব প্রজন্মের এই জঙ্গিরা সোশ্যাল মিডিয়ার—মোবাইল, ইন্টারনেট, ফেসবুক-টুইটারের মতো যোগাযোগের প্রতিটি মাধ্যমকে দক্ষতার সঙ্গে কাজে লাগাইয়াছে।

বরাবরের মতো এবারও ঘোলা জলে মাছ ধরিতে নামিয়া পড়িয়াছে পাকিস্তান। সার্ক গোষ্ঠীর বৈঠকের আগে জঙ্গি নেতা বুরহানের মৃত্যুতে জ্বলে ওঠা আগুনে পাকিস্তান যে হাওয়া দিতে সচেষ্ট, এখন তাহা স্পষ্ট। সন্ত্রাসের প্রশ্নে চাপে থাকা পাকিস্তান সার্ক বৈঠকে কাশ্মীরের পরিস্থিতির প্রসঙ্গকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করিতে চায়। তাই যতদিন সম্ভব কাশ্মীরে আগুন জ্বালাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিবে। পাকিস্তানের আরও একটি ছক—উপত্যকায় অশান্তি ছড়াইয়া দিয়া এই দেশের সরকার তথা নিরাপত্তা বাহিনীর দৃষ্টি ঘুরাইয়া সীমান্ত পার করিয়া দলে দলে জঙ্গি ঢুকাইয়া দেওয়া। পাকিস্তানের মতলব বুঝিয়া ভারতের বিদেশমন্ত্রকও এক কড়া বার্তায় স্পষ্ট করিয়া দিয়াছে—বুরহান ওয়ানি লইয়া পাক-বিবৃতিতে বোঝা যাইতেছে পাকিস্তান এখনও সন্ত্রাসের সঙ্গে যুক্ত।

কোনো কোনো মহল হইতে এই বিক্ষোভকে স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ বলিয়া যে দাবি করা হইতেছে, তাহা যে একটি ষড়যন্ত্রেরই অংশ, প্রাপ্ত গোয়েন্দা তথ্যে তাহা স্পষ্ট। প্রাপ্ত ভিডিও ফুটেজে দেখা যাইতেছে—বুরহানের মৃত্যুতে শোকজ্ঞাপক অনুষ্ঠানে পাক-অধিকৃত মুজফ্‌ফরাবাদে হিজবুল নেতা সইদ সালাউদ্দিনের সঙ্গে রহিয়াছে ২৬/১১-র মূলচক্রী হাফিজ সইদ। পরিকল্পনা অনুসারে ভারত-বিরোধী প্রচার জোরদার করিবার উদ্দেশ্যে সোশ্যাল নেট ওয়ার্কিং সাইটে প্রতি মিনিটে 'শহিদ' বুরহানের ছবি, উত্তেজক ভারত-বিরোধীবার্তা এবং সেইসঙ্গে উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে অভিযুক্ত করিয়া বেশ কিছু বানানো ছবি ও ভিডিয়ো ছড়াইয়া দেওয়া হইতেছে। তাহারই পরিণতি ৩২ জনের মৃত্যু, আহত তিন শতাধিক।

বুরহান ওয়ানির মৃত্যু নিরাপত্তা বাহিনীর কাছে বিরাট সাফল্য হিসাবে গণ্য হইলেও এই দেশের একাংশ বুরহানকে বিপ্লবীর মর্যাদা দিতে চাহিতেছে। যেমন জেএনইউ ছাত্রনেতা উমর খালিদ, যাহার বিরুদ্ধে দেশবিরোধী স্লোগান দেওয়ার গুরুতর অভিযোগ উঠিয়াছিল। প্রশ্ন হইল, রাহুল গান্ধী, সীতারাম ইয়েচুরি, ডি রাজার মতো 'সেকুলারবাদী' রাজনৈতিক নেতা ও বুদ্ধিজীবীরা এখন কোথায়? তথাকথিত এইসব নেতা ও বুদ্ধিজীবীর দল যে দেশের পরিবেশ বিষাইয়া তুলিতেছেন তাহা আজ পরিষ্কার। এই ঘরশত্রুরাই দেশের স্থিতিশীলতাকে বারবার বিঘ্নিত করিয়া চলিতেছে। কাশ্মীরের ঘটনা জাতীয় উদ্বেগের কারণ; তাই কোনো ভাবেই সংকীর্ণ রাজনৈতিক ভাবনাকে বরদাস্ত করা যাইবে না।

সুভাষিতম্

একোপি গুণবান পুত্রো নির্গুণৈশ্চ শতৈর্বর।
একশ্চন্দ্রস্তমো হন্তি ন চ তারাঃ সহস্রশঃ।। (চাণক্যনীতি)

বুদ্ধিহীন শতপুত্রের চেয়ে গুণবান একটি পুত্রই ভালো। একটি চাঁদ রাত্রিকালে অন্ধকার দূর করতে পারে, হাজার হাজার নক্ষত্র তা পারে না।

পাকিস্তানের উস্কানিতে কাশ্মীর অশান্ত : বেঙ্কাইয়া নাইডু

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ তথ্য ও বেতার সম্প্রচার মন্ত্রী এম. বেঙ্কাইয়া নাইডু পাকিস্তানের সাম্প্রতিক আচরণে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে হিজবুল মুজাহিদিন কম্যান্ডার বুরহান ওয়ানি নিহত হবার পর থেকে কাশ্মীরে বিক্ষোভ চলছে। আর পাকিস্তান নানাভাবে সেই বিক্ষোভে উস্কানি দিচ্ছে। পাকিস্তান যদি অবিলম্বে এই আচরণ বন্ধ না করে তা হলে ভারত তার পাকিস্তাননীতি পরিবর্তন করতে বাধ্য হবে বলে মন্ত্রী হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। বেঙ্কাইয়া নাইডু বলেছেন, 'ভারত পাকিস্তানের সঙ্গে সৌহার্দ্য বজায় রেখে চলতে চায়। কিন্তু পাকিস্তান যদি ক্রমাগত কাশ্মীরে অশান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করে তাহলে ভারত তার বৈদেশিক নীতি নিয়ে ভাবতে বাধ্য হবে।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বুরহান ওয়ানির মৃত্যুর পর কাশ্মীরের জনগণের একাংশ নিহত সন্ত্রাসবাদীর সমর্থনে একটানা বিক্ষোভে শামিল হয়েছে। বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষে ২৩ জন মারাও গিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে বেঙ্কাইয়া নাইডুর প্রশ্ন, 'ওয়ানি ছিল হিজবুল মুজাহিদিনের কম্যান্ডার। ভারতীয় হয়ে কাশ্মীরের লোক কীভাবে একজন সন্ত্রাসবাদীর মৃত্যুতে বিক্ষোভ দেখাতে পারে?' দেশের যেসব রাজনৈতিক দল এবং নেতানেত্রী বিক্ষোভকারীদের প্রতি সহানুভূতি দেখাচ্ছেন তাদের সাবধান করে দিয়ে তিনি বলেছেন, 'কোনো ভাবেই সন্ত্রাস বা হিংসা বরদাস্ত করা হবে না। পরিস্থিতি সামাল দিতে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার একযোগে কাজ করবে।' কাশ্মীর যে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং কোনো অবস্থাতেই ভারত অঙ্গহানি ঘটতে দেবে না— একথাও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়েছেন মন্ত্রী।

সংবাদ প্রতিবেদন

ইদের নমাজের পর মুসলমানদের স্লোগান

'দিনাজপুর দিনাজপুর, হিন্দু তোমরা ভাগো দূর'

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ এরপর ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা কী বলবেন? ইদের দিন উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপরা ব্লকের রামগঞ্জ গ্রামে বসবাসকারী মুসলমানদের একাংশ স্থানীয় হিন্দুদের ঘরবাড়ি লুট করে। মোটরবাইকে আগুন লাগিয়ে দেয়। সংঘর্ষে আহত হন কয়েকজন। হিন্দুদের অপরাধ তারা ফতোয়া অমান্য করে রথযাত্রা উৎসব পালন করেছিল। পুলিশের বক্তব্য, পরিস্থিতি এখন সীমান্ত রক্ষাবাহিনীর কন্ট্রোলে। গত বুধবার (৬ জুলাই) ছিল রথযাত্রা উৎসব। চোপরা গ্রামের নৈনিতাল কলোনির বাসিন্দারা প্রত্যেক বছর দিনটা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে পালন করেন। কিন্তু এবছর স্থানীয় মুসলমানদের তরফ থেকে ফতোয়া জারি করা হয়, হিন্দুরা রথযাত্রা উৎসব পালন

রামগঞ্জের সেই রথ।

করতে পারবেন না। কারণ তাতে মুসলমানদের ইদ উৎসবের পবিত্রতা নষ্ট হতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এবারে ইদ ছিল ৭ জুলাই অর্থাৎ রথযাত্রার ঠিক পরের দিন। ফতোয়ায় স্বাক্ষর করে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে সমাজবিরোধী এবং মৌলবিরাও। সারাদিন দফায় দফায় মসজিদের মাইকে ফতোয়ার কথা ঘোষণা করা হয়। কিন্তু এত কিছুর পরেও হিন্দুরা তাদের উৎসব বন্ধ করেননি। যথাসময়ে জগন্নাথ- বলরাম-সুভদ্রাকে নিয়ে রথ বের হয়। মুসলমানরা তাতে ক্ষেপে গিয়ে কাঁচাকলি অঞ্চলে বিকেল সাড়ে চারটের সময় রথযাত্রার মিছিলে আক্রমণ করে। তখন ক্ষয়ক্ষতি বিশেষ হয়নি। নির্বিঘ্নে ফিরে আসে রথ।

চক্রান্ত শুরু হয় এরপর। পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান বসতি প্রধান জেলাগুলির মধ্যে উত্তর দিনাজপুর অন্যতম। সূত্রে খবর, ইসলামি ফতোয়াকে তুচ্ছ করে সংখ্যালঘু হিন্দুদের এহেন বেয়াদপির উচিত জবাব দিতে রথের দিন রাত্রেই বসে বিশেষ মন্ত্রণাসভা। পরেরদিন ইদের নমাজের পর হিন্দুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে একদল বীরপুঙ্গব। শুরু হয় লুঠতরাজ, অগ্নিসংযোগ, মেয়েদের শ্লীলতাহানি। 'আল্লা হো আকবর' ও 'দিনাজপুর দিনাজপুর, হিন্দু তোমরা ভাগো দূর'— স্লোগানে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। ভীত সন্ত্রস্ত হিন্দুরা দরজায় তালা দিয়ে পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা করে। কিন্তু তাতেও শেষরক্ষা হয়নি। মুসলমান সমাজবিরোধীরা তালা ভেঙে লুঠপাট চালায় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের দাবি সংঘর্ষে দু'জন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ সম্পূর্ণ ব্যর্থ বলে তাদের অভিযোগ। উত্তর দিনাজপুর জেলা বিজেপির সভাপতি নির্মল দাম বলেন, 'এই ঘটনা পরিকল্পিত ঘটনা। মৌলবাদীদের দিয়ে এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে। বাংলাদেশ-কালিয়াচকের ঘটনার পুনরাবৃত্তি এই ঘটনা। আমরা এর তীব্র নিন্দা করছি। এসব যদি বন্ধ না হয় তা হলে আমরা আগামীদিনে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলব।' শাসকদলের কোনো নেতানেত্রী বা বাম-কংগ্রেস বিরোধী জোটের প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। উত্তর দিনাজপুরের হিন্দুরা এই মুহূর্তে আতঙ্কিত। তাদের প্রশ্ন এখনই যদি পশ্চিমবঙ্গের এই হাল হয় তাহলে কয়েক দশক পর কী হতে চলেছে।

সংবাদ প্রতিবেদন

ডাকঘরে গঙ্গাজল বিক্রি, মানুষের প্রবল উৎসাহ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ হৃষীকেশ ও গঙ্গোত্রীর গঙ্গার বোতলবন্দি জল কেনার জন্য অনেকেই নিকটবর্তী ডাকঘরে এসেছিলেন। কেউ পেয়েছেন, কেউ পাননি। কারণ কাউন্টার খোলার কিছুক্ষণের মধ্যেই স্টক শেষ! হাসিখুশি মুখের পাশেই একগুচ্ছ হতাশ আর করুণ মুখ। অনেকেরই প্রশ্ন, 'পরে আবার পাওয়া যাবে তো?' সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সারা দেশের ৮০৯টি ডাকঘরের মাধ্যমে হৃষীকেশ ও গঙ্গোত্রীর বোতলবন্দি গঙ্গাজল বিক্রি শুরু হয়েছে। উত্তর ভারতের গঙ্গার জল তুলনায় অমলিন, পবিত্র। ঈশ্বরের সেবার উপযোগী। সেই কারণে সারা দেশেই মানুষের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

উদ্দীপনার একই ছবি দেখা গেছে পশ্চিমবঙ্গেও। রাজ্যের মোট ৫টি (জিপিও, কলকাতা, হাওড়া, মেদিনীপুর ও শিলিগুড়ি) ডাকঘরে শুরু হয়েছে গঙ্গাজল বিক্রি। রাজ্যের কোটার ৫০০ মিলির ২৮০টি এবং ২০০ মিলি-র ২৪৫টি বোতল (হৃষীকেশের গঙ্গাজলের) প্রায় চোখের নিমেষে বিক্রি হয়ে যায়। শিলিগুড়ি পোস্ট অফিসের কর্মী অভিজিত সরকার বললেন, '২০০ মিলি-র ৫টি বোতল আমাদের পাঠানো হয়েছিল যা শো-কেসে রাখার আগেই বিক্রি হয়ে যায়। যারা পাননি হতাশ হয়ে আমাদের গালিগালাজ করতে শুরু করেন।'

মধ্য কলকাতার ব্যবসায়ী অশোক আগরওয়াল জিপিও থেকে বিক্রি হওয়া প্রথম বোতলটি কিনেছেন। তিনি বললেন, 'গঙ্গা ভারতের সব থেকে পবিত্র নদী। আমি ভাগ্যবান এত সহজে বোতলটা পেয়ে গেলাম।' হৃষীকেশ ও গঙ্গোত্রীর গঙ্গাজল বাড়িতে আনার এই অফুরান উৎসাহের প্রেক্ষাপটে রয়েছে হুগলী নদীর অবক্ষয়। সাম্প্রতিক গবেষণায় জানা গেছে, হুগলীর জল ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়ার প্রকোপে মারাত্মকভাবে দূষিত। পান তো দূর, স্নানেরও অনুপযোগী। সুরেন্দ্র সিং বললেন, 'তবুও আমরা এই জল পুজোয় ব্যবহার করি। ঠাকুরকে নিবেদন করার সময় প্রত্যেকবার মন খারাপ হয়ে যায়।' গাঙ্গেয় সমতল থেকে যারা দূরে থাকেন গঙ্গাজলের জন্য তাদের আর্তিও এই প্রকল্পের সাফল্যের একটা বড়ো কারণ বলে মনে করছে তথ্যাভিজ্ঞ মহল।

পশ্চিমবঙ্গের মোট ৪৬টি পোস্ট অফিসের মধ্যে ৫টি বেছে নেওয়া হয়েছে গঙ্গাজল বিক্রির জন্য। ডাকবিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর স্বপন গড়াই বললেন, 'সাপ্লাই নিয়মিত হলে আমরা প্রতিটি প্রধান এবং সাব-পোস্ট অফিস থেকেই গঙ্গাজল বিক্রি করব।' হৃষীকেশের ২০০ মিলি বোতলের দাম ১৫ টাকা আর ৫০০ মিলির দাম ২২ টাকা রাখা হয়েছে। গঙ্গোত্রীর গঙ্গাজলের দাম একটু বেশি। ২০০ মিলি ২৫ টাকা, ৫০০ মিলি ৩৫ টাকা। অনলাইনেও কেনা যাবে গঙ্গাজল। সেক্ষেত্রে ডাক খরচ গ্রাহককে বহন করতে হবে। দূরত্ব অনুযায়ী যা ১৭ থেকে ৪০ টাকার মধ্যে হবে।

ছত্তিশগড়ে মাওবাদীদের মোকাবিলায় 'বস্তারিয় ব্যাটালিয়ন'

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ মাওবাদীদের মোকাবিলার জন্য ছত্তিশগড়ে এক নতুন ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সি আর পি এফ)-এর অধীনে শুধু স্থানীয় তপশিলি উপজাতি যুবকদের নিয়ে একটি বাহিনী গঠনের প্রস্তাব কেন্দ্র সরকার অনুমোদন করেছে। এই বাহিনীর নাম দেওয়া হয়েছে— বস্তারিয় ব্যাটালিয়ন। এই ধরনের উদ্যোগ এই প্রথম। কয়েকদিনের মধ্যেই এই বাহিনীতে লোক নিযুক্তির জন্য এক বিশেষ অভিযান রাজ্যের চারটি জেলায় শুরু হবে। জেলাগুলি হলো সুকমা, দান্তেওয়াড়া, নারায়ণপুর ও বিজাপুর।

এইসব জেলা থেকে স্থানীয় তপশিলি উপজাতিভুক্ত ৭৪৪ জন যুবককে বেছে নেওয়া হবে। এজন্য শারীরিক ভাবে যে যোগ্যতার প্রয়োজন, তার কিছু হেরফেরও করা হচ্ছে। কেননা অন্য রাজ্যের তুলনায় স্থানীয় যুবকরা উচ্চতায় একটু খাটো। কিন্তু উন্নয়নের আলো থেকে বঞ্চিত ও বেকার যুবকদের একটা সুযোগ দেওয়ার জন্য উচ্চতা ১৬০ সেন্টিমিটার থেকে কমিয়ে ১৫৫.৫ সেন্টিমিটার, বুকের ছাতির মাপ (ফোলানো অবস্থায়) এবং ওজনের মাপকাঠি কমানো হচ্ছে।

বাহিনীর এক আধিকারিকের কথায়, এখন যারা এই এলাকায় রয়েছে তাদের থেকে এইসব স্থানীয় ছেলেরা বেশি যোগ্য হবে। কেননা তারা এখানকার বনাঞ্চলের সুলুক-সন্ধান জানে। স্থানীয়রা জঙ্গল যুদ্ধে একটা সম্পদ হয়ে উঠতে পারে। জঙ্গলে তারা ভালো যুদ্ধ করতে পারবে। কোথা দিয়ে দ্রুত চলাচল করা যায় তারা তা জানে। তারা খবর সংগ্রহের জন্য নিজেদের 'ইনফরমার নেটওয়ার্ক' তৈরি করে নিতে পারবে।

স্থানীয় গ্রামের মানুষও এদের আরও বেশি সাহায্য করবে। সত্যি কথা বলতে কী, এরা বাহিনীর একটা শক্তিশালী স্তম্ভ হয়ে উঠবে। প্রাপ্ত সূত্র অনুসারে, স্থানীয়দের এই নিযুক্তিতে সরকারকে অতিরিক্ত কোনো ব্যয়ভার বহন করতে হবে না। এর আগে এইসব স্থানীয়দের পুলিশ ও ফোর্সের 'ইনফরমার' হিসেবে ব্যবহার করা হোত। কিন্তু তাদের ফোর্সে নেওয়ার কথা ভাবা হয়নি। কেননা ফোর্সের জন্য নির্ধারিত শারীরিক যোগ্যতায় তারা উত্তীর্ণ হতে পারবে না। এইসব স্থানীয়দের যাতে কর্মসংস্থান হয় এবং মাওবাদীদের প্রতি আকর্ষণ বোধ না করে এই দুই দিক ভেবে এদের শারীরিক যোগ্যতার মাপকাঠি শিথিল করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং তা অনুমোদন করেছেন।

কৃষিক্ষেত্রে জৈবপ্রযুক্তি ব্যবহারে নোবেলজয়ীদের উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বহুজাতিক সংগঠন গ্রিনপিস ইন্টারন্যাশনালের অনৈতিক কাজকর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হয়েছেন ১০৯ জন নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী। তাঁদের স্বাক্ষর-সংবলিত একটি আবেদনপত্র সম্প্রতি গ্রিনপিস ইন্টারন্যাশনালের মুখ্য কার্যালয় আমস্টারডমে পাঠানো হয়েছে। তাঁদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে গ্রিনপিস ইন্টারন্যাশনাল সারা বিশ্বজুড়ে জেনেটিকালি মডিফায়েড অর্গানাজিম, সংক্ষেপে জিএমও প্রযুক্তির সুষ্ঠু প্রয়োগে বাধা সৃষ্টি করছে। আবেদনপত্রে তাঁরা সংস্থাটিকে সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ করেছেন। সেইসঙ্গে কৃষিক্ষেত্রে জৈবপ্রযুক্তির সাম্প্রতিক আবিষ্কারগুলি আরও বেশি করে প্রয়োগ করার জন্য তাঁরা বিভিন্ন দেশের সরকারকেও অনুরোধ করেছেন।

খবরে প্রকাশ, গ্রিনপিস ইন্টারন্যাশনাল নামক সংস্থাটি বিভিন্ন দেশে স্থানীয় কৃষক এবং কৃষিপেশার সঙ্গে জড়িত অন্যান্য সাধারণ মানুষকে নানাভাবে ভয় দেখিয়ে হুমকি দিয়ে জিএমও অনুমোদিত শস্যবীজ সার কৃষিপ্রযুক্তি ব্যবহার করতে দিচ্ছে না। গোল্ডেন রাইস এরকমই একটি উচ্চফলনশীল এবং স্বাস্থ্যকর ধানবীজ। বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন এই বীজ থেকে উৎপাদিত চাল ভিটামিন এ-র অভাবজনিত যে-কোনো অসুখ নিরাময় করতে পারে। অন্যদিকে, এই চালের ভাত খেলে মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়বে বলে গ্রিনপিস ইন্টারন্যাশনাল এবং তাদের কিছু পেটোয়া সংস্থা অপপ্রচার চালাচ্ছে। প্রতিবাদী বিজ্ঞানীদের মুখপাত্র রিচার্ড জে. রবার্টস এবং ফিলিপ এ. শার্প (১৯৯৩ সালে চিকিৎসা বিজ্ঞানে যুগ্ম নোবেল বিজেতা) বলেছেন, 'আমরা বিজ্ঞানী। আমরা শুধু বৈজ্ঞানিক যুক্তি বুঝি। এটা বলা খুবই সহজ গ্রিনপিস যা করছে সেটা সম্পূর্ণ বিজ্ঞানবিরোধী।' সম্প্রতি ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে বিজ্ঞানীদের অভিযোগ, স্রেফ টাকার জন্য গ্রিনপিস জৈবপ্রযুক্তির অত্যাধুনিক আবিষ্কারগুলিকে মানুষের সেবার লাগতে দিচ্ছে না। দিনের পর দিন জি এম ও-বিরোধী অপপ্রচার চালিয়ে সভ্যতাকে পঙ্গু করে দিচ্ছে। এই অসাধু প্রবণতা বন্ধ করতে তাঁরা প্রত্যেকটি দেশের সরকারকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

সরকারের শাস্তিমূলক ব্যবস্থার ভয়ে তেরো হাজার কোটি টাকা বিদেশে সরানো গোপন অর্থ দেশে ফিরতে চলেছে

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ভারত সরকার বেশ কিছুদিন ধরেই কড়া হাতে বিদেশে পাচার করা কালো টাকা উদ্ধার করার যে লাগাতার চেষ্টা করে আসছিল তার কিছু সুফল পাওয়ার লক্ষণ দেখা দিচ্ছে। ভারতীয় আয়কর দপ্তর ২০১১ ও ২০১৩ সালে পাওয়া দু'টি গোপন খবরের ভিত্তিতে বিদেশের ব্যাঙ্কে গচ্ছিত তেরো হাজার কোটি টাকার অঘোষিত আয়ের সন্ধান পেয়েছে।

এই সূত্রে ফরাসি সরকারের দেওয়া ২০১১ সালের তথ্যের ভিত্তিতে এইচ এস বি সি ব্যাঙ্কে ৪০০ ভারতীয় অ্যাকাউন্টের সন্ধান মিলেছে। এই খবরের ভিত্তিতে তদন্ত চালিয়ে আয়কর বিভাগ ৮১৮৬ কোটি টাকার অঘোষিত আয়কে চিহ্নিত করেছে। দেশের বাইরে অফ শোর ব্যাঙ্কে অতীতে কখনও এত বেশি অঙ্কের কালো টাকার হদিশ পাওয়া যায়নি। আয়কর দপ্তর ওই টাকার ওপর ৫৩৭৭ কোটি টাকা অ্যাকাউন্টের মালিকদের জরিমানা হিসেবে ধার্য করেছে। এই হিসেবটি মার্চ ২০১৬ অর্থবর্ষে আয়কর দপ্তরের করা অ্যাসেসমেন্ট মোতাবেক নির্ণীত হয়েছে। প্রসঙ্গত সরকার এইচ এস বি সি ব্যাঙ্কের যে ৬২৮টি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সন্ধান পায় তার মধ্যে তদন্ত করে দেখা যায় ২১৩টি অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে কোনো অর্থনৈতিক অপরাধের ধারা চাপানো যাবে না। কেননা সেগুলিতে কোনো টাকা নেই কিংবা অ্যাকাউন্টের মালিক বেপাত্তা। আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া যায়— এমন ৩৯৮টি ক্ষেত্রে আয়কর বিভাগ প্রথামাফিক অ্যাসেসমেন্ট সেরে ফেলেছে। এর মধ্যে আই টি সেটেলমেন্ট কমিশনের মাধ্যমে মিটিয়ে ফেলা ও মামলা না চালানোর মামলাগুলিও রয়েছে। এ বিষয়ে এইচ এস বি সি-র মুখপাত্রের কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

এছাড়া ২০১৩ সালে ওয়াশিংটনে অবস্থিত International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ)-এর মাধ্যমে আয়কর দপ্তর বিদেশি ব্যাঙ্কে আরও ৫ হাজার কোটি টাকার অঘোষিত আয়ের সন্ধান পেয়েছে, যার মালিকানা রয়েছে সাতশো ভারতীয়ের নামে।

এই মর্মে আয়কর দপ্তর ইতিমধ্যেই ৫৫টি স্বইচ্ছায় কর ফাঁকি দেওয়ার অপরাধে নির্দিষ্ট মামলা আই সি আই জে-এর সূত্র অনুযায়ী ফৌজদারী আদালতে দাখিল করেছে। এই কর ফাঁকি চক্রের কাজের কৌশল অনুযায়ী বেআইনী কর ফাঁকি দেওয়া অ্যাকাউন্টগুলির শেষ বেনিফিসারিরা ভারতীয়। আয়কর তদন্তকারীদের তথ্য অনুযায়ী এই অ্যাকাউন্টগুলি সবই খোলা হয়েছে বৃটিশ ভার্জিন আইল্যান্ডে। দপ্তর জাল গোটাচ্ছে বলে খবর।

মালদহে সীমান্ত আই এস জঙ্গিদের করিডোর

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ভারত ও বাংলাদেশে ত্রাস সৃষ্টি করতে আই এস জঙ্গিদের জন্য বিস্ফোরক তৈরি হচ্ছে মালদহের বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতে— এমন চাঞ্চল্যের তথ্য প্রকাশ করেছে গোয়েন্দা দপ্তর। সি আই ডি-র হাতে ধৃত জঙ্গি মুসাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই তথ্য গোয়েন্দারা জানতে পেরেছেন। সীমান্ত এলাকার সচেতন নাগরিকদের দাবি, বাম আমলে এবং বর্তমান শাসকদল তৃণমূলের প্রত্যক্ষ মদতেই মালদা সীমান্ত জঙ্গি কাজকর্মের এমন মুক্তাঞ্চল হয়ে উঠেছে। গোয়েন্দা তথ্য অনুযায়ী খাগড়াগড়কাণ্ডে পালিয়ে যাওয়া জামাতউল মুজাহিদিনের সদস্য জঙ্গি নাসিরুল্লার নেতৃত্বে মালদহ সীমান্ত এলাকায় বিস্ফোরক তৈরি হচ্ছে। গোয়েন্দাদের তথ্য অনুযায়ী গ্রেনেড ও উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিস্ফোরক এই এলাকায় তৈরি করার জন্য রীতিমতো ল্যাবরেটরি তৈরি করা হয়েছে। এজন্য জেলার বেশ কিছু সন্দেহভাজন যুবকের ওপর নজর রাখা হয়েছে।

উবাচ

"এটা শুনে যে কেউ খুশি হবে যে এ রাজ্যে প্রতি বছর অগ্রগতি ও উন্নয়ন ঘটছে। আমাদের রাজ্য মানুষ কেনাবেচার ব্যবসায় উন্নতি করছে।"

মঞ্জুলা চেল্লুর
প্রধান বিচারপতি,
কলকাতা হাইকোর্ট

কলকাতা হাইকোর্টে মানুষ ব্যবসা নিয়ে এক আলোচনা সভায়।

"হিন্দুরা যেখানে সংখ্যালঘু, সেখানেই দেশবিরোধী গতিবিধি বাড়ছে। এই ঘটনা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়।"

দিলীপ ঘোষ
বিজেপি
রাজ্য-সভাপতি

ইসলামপুরে রথউৎসবে হামলা প্রসঙ্গে।

"আমরা আপনার নেতৃত্বে চলব, কিন্তু আপনাকে অবশ্যই নেতৃত্ব দিতে হবে।"

ওমর আবদুল্লা
কাশ্মীরে বিরোধী
দলনেতা

কাশ্মীর উপত্যকায় সাম্প্রতিক উত্তেজনা প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতিকে।

"কংগ্রেসের জন্য করুণা হয়। তারা মোদী সরকারের ওপর ৪৫ হাজার কোটি টাকার কেলেঙ্কারির অভিযোগ এনেছে। জানা গেছে, ওই কেলেঙ্কারি ইউপিএ আমলের। মাফ করবেন, আমরা ইউপিএ-র কেলেঙ্কারির দায় নিতে পারবো না।"

কিরণ রিজিজু
ভারতের স্বরাষ্ট্র
প্রতিমন্ত্রী

"অবাক হতে হয় যে, সংবাদমাধ্যমের একটি অংশ কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের উদার হিসেবে দেখিয়ে চলেছে। এর দ্বারা সন্ত্রাসবাদের প্রতি তাদের গোপন প্রেমই প্রকাশিত হচ্ছে।"

স্বপন দাশগুপ্ত
বিশিষ্ট সাংবাদিক

হিজবুল কম্যান্ডার বুরহান ওয়ানির মৃত্যুতে কাশ্মীরে গণবিক্ষোভ প্রসঙ্গে।

মুসলমান বেকার যুবকরাই আপাতত টার্গেট আই এস-এর

নিজস্ব প্রতিনিধি।। কাশ্মীর নিয়ে অশান্তির মাঝেই জঙ্গিয়ানা সংক্রান্ত আরও বড়ো চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এল গোয়েন্দা রিপোর্টে। সি আই ডি সূত্রে খবর, সম্প্রতি ধৃত আই এসের লিঙ্কম্যান মহম্মদ মসিরুদ্দিনকে জেরায় জানা গিয়েছে, বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলি বিশেষ করে বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ ও বীরভূমে বেকার মুসলমান যুবকদের 'টার্গেট' করার বিষয়ে পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়েছে। অন্যদিকে তামিলনাড়ুতে মসিরুদ্দিনের বাড়ি থেকে যে ল্যাপটপ উদ্ধার করা হয়েছে তার তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যাচ্ছে শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, জম্মু-কাশ্মীর এবং দিল্লীতেও আই এসের জন্য বেকার মুসলমান যুবক জোগাড়ের কাজ করতো সে। ই-মেল, বিভিন্ন সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট এবং মোবাইলের মাধ্যমে বাংলাদেশের জামাত-উল-মুজাহিদিন নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতো মসিরুদ্দিন। গোয়েন্দা সূত্রে স্পষ্ট যে বর্তমান জামাত সংগঠন পুরোপুরি আই এস-এর কব্জায়। গোয়েন্দাদের বক্তব্য, রাকার সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতা বাড়াতে মরিয়া মসিরুদ্দিন ভারতে আই এসের জাল ছড়াতে নানান পরিকল্পনা নিয়েছিল এবং একাজে মুসলমান বেকার যুবকদের মগজধোলাই ও বিভিন্ন অসাধু প্রলোভনের মাধ্যমে প্ররোচিত করাই ছিল তার প্রধান লক্ষ্য।

সি আই ডি-র গোয়েন্দাদের ধারণা ছিল পশ্চিমবঙ্গ এবং তামিলনাড়ুর মধ্যেই মসিরুদ্দিনের গতিবিধি সীমিত। কিন্তু তাকে জিজ্ঞাসাবাদের পর ও তার ল্যাপটপ থেকে যে মুসলমান যুবকদের 'রিক্রুট' করার জন্য তাদের ফোন নম্বরগুলি উদ্ধার করা গিয়েছে তার ভিত্তিতে উত্তর-ভারতীয় বিভিন্ন রাজ্যেও আই এসের ছড়ানো জালের সন্ধান পেয়েছেন গোয়েন্দারা। তবে জাতীয় স্তরের গোয়েন্দার বিশেষ মাথাব্যথা অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে। ২০১৪-য় খাগড়াগড় কাণ্ডের পর এ রাজ্যের সন্ত্রাস-মানচিত্রে বর্ধমান জেলা শীর্ষস্থান অধিকার করে নিয়েছিল। এ বছরের মার্চে সন্ত্রাসবাদী যোগ-সাজশের অভিযোগে ১৯ বছরের এক কিশোর, দুর্গাপুরে পলিটেকনিক ছাত্র আশিক আহমেদকে গ্রেপ্তার করা হয়। আশিকের বাড়ি হুগলির ধনিয়াখালিতে। তাকে গ্রেপ্তার করতে একটা সময় যথেষ্ট ইতস্তত করছিলেন গোয়েন্দারা। কারণ ধনিয়াখালিতে ওই বাড়িতে তল্লাসি চালিয়ে এমন কিছু পাওয়া যায়নি যা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা যেতে পারে। ফেব্রুয়ারিতে উত্তরপ্রদেশে ধৃত আবদুস সামি কোয়াসমিকে জিজ্ঞাসাবাদের সময় খালি আশিক আহমেদ ওরফে রাজার নাম পাওয়া যায়।

পুরে পরিকল্পনাটা স্পষ্ট হয়ে যায় গোয়েন্দাদের সামনে। তাদের বক্তব্য, আপাতভাবে এটাই আই এসের পরিকল্পনা। যে মুসলমান কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতীদের বিরুদ্ধে কোনো ক্রিমিনাল রেকর্ড নেই এবং যারা বর্তমানে পড়াশোনা করছে, তাদের রিক্রুট করা। এরপর তাদের মগজধোলাই হবে। মগজধোলাইয়ের শেষে বোঝানো হবে সিরিয়ার যুদ্ধে এখনই তাদের কোনো দরকার নেই। বরং নিজের জন্মভূমিতে 'জেহাদ' চালানোই তাদের কর্তব্য। সুতরাং এভাবেই এখানে আই এস তাদের বিখ্যাত রণকৌশল 'একক নেকড়ে' আক্রমণের পরিকল্পনা করেছে।

অপরাধ জগতে ইতিপূর্বে নাম না থাকার সুবাদে এবং বয়স অল্প হওয়ার কারণে আই এসের রিক্রুটেড যুবক-যুবতীরা পুলিশ-গোয়েন্দাদের চোখেও ধুলো দিতে পারবে বলে গোয়েন্দাদের আশা। ২০১৫-র গোয়েন্দা রিপোর্টেই দেখা গিয়েছিল যে বর্ধমান, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, উত্তর চব্বিশ পরগনা, মালদা, বীরভূমের মতো সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে মুসলমান যুবকদের জামাতে যোগদানের প্রবণতা বাড়ছে। সেই সূত্রে এখন স্পষ্ট আই এসও এইসব জেলাগুলিতে নিজের শক্তি বৃদ্ধি করছে। বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়ায় তাদের প্রভাব বেশি হওয়ায় গোয়েন্দাদের চ্যালেঞ্জ আরও বেশি বলেই মনে করছে তথ্যাভিজ্ঞ মহল।

মুখোশ খুললো উমর খালিদের

নিজস্ব প্রতিনিধি।। জে এন ইউ-য়ে আফজল গুরুর মৃত্যুবার্ষিকী পালন ছিল বাক্-স্বাধীনতা। আর এই বাক্-স্বাধীনতার হোতাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন কানহাইয়া কুমার ও উমর খালিদ। কাশ্মীরে উগ্রপন্থী নেতা বুরহান ওয়ানির মৃত্যুতে আপাতত খুলে গেল উমরের মুখোশ। সেই সঙ্গে বেআব্রু হয়ে বেরিয়ে পড়লো তার তাঁবেদারদের আসল চেহারাও। উমরের চোখে বুরহান হলো একধরনের বিপ্লবী। তাই তার মৃত্যু নিছক 'মৃত্যু' নয়। সে হলো গিয়ে শহিদ। একটি ফেসবুক পোস্টে ভারতকে বিস্তর গালমন্দ করার পাশাপাশি চে গেভারার সঙ্গে উগ্রপন্থী বুরহানের তুলনাও টেনেছে খালিদ। এটুকু এখন স্পষ্ট যে পাক-চীনের মদতেই অশান্ত হচ্ছে কাশ্মীর। বিশ্বের সন্ত্রাস- মোকাবিলা পরিস্থিতি জটিল করতেও কম চেষ্টা করছে না ওই দুই দেশ। গোটা বিশ্ব যখন সন্ত্রাসে বিপর্যস্ত, তখন ওই দুই দেশের নক্কারজনক ভূমিকা বিশ্ববাসীর চরম ক্ষোভের কারণ হয়েছে।

ভারতের পরিস্থিতি আরও জটিল। এদেশের বিচার-ব্যবস্থার দ্বারা দোষী সাব্যস্ত, এখানকার সংবিধান দ্বারা ফাঁসির সাজাপ্রাপ্ত আসামীর মৃত্যুবার্ষিকী পালন যাদের কাছে বাকস্বাধীনতার প্রকাশ, সেদেশে সন্ত্রাস-মোকাবিলা যে কতটা বিপজ্জনক সাম্প্রতিক ঘটনাবলিই চোখে আঙুল দিয়ে তা দেখিয়ে দিচ্ছে বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত। উমরের রাজনৈতিক মদতদাতারা অবশ্য এক্ষেত্রে মূক-বধির সাজাই শ্রেয় মনে করেছেন। কিন্তু শাক দিয়ে কী আর মাছ ঢাকা যায়!

ভারতীয় মুসলমানদের প্রমাণ করার এটাই উপযুক্ত সময় যে তারা সবাই জেহাদি নয়

ঢাকায় জেহাদি জঙ্গিদের ভয়াল আক্রমণের পর আমাদের এপার বাংলার কিছু বুদ্ধিজীবী প্রচার করছেন যে ইসলাম শান্তি ও সম্প্রীতির বার্তা বহন করে। ইসলাম সর্ব ধর্মের সহাবস্থানে বিশ্বাসী। কোরানে এমন শিক্ষাই দেওয়া হয়েছে। অথচ বাস্তব অন্য কথা বলছে। ইতিহাসও অন্য কথা বলছে। দ্বাদশ শতকে বিশ্বত্রাস ইসলামের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে রক্ত ও হত্যার যুগলবন্দি শুরু হয় এশিয়া মহাদেশজুড়ে। প্রচার করা হয় কাফের বা আল্লার শ্রেষ্ঠত্বে অবিশ্বাসীদের প্রাণে বেঁচে থাকার অধিকার নেই। তৈমুর থেকে চেঙ্গিজ, বাবর থেকে ঔরঙ্গজেব ইসলামের একচ্ছত্র অধিকার কায়েম করতে তরবারিকে আশ্রয় করেছে। তাই বলছি কোরানে যদি শান্তির বাণী প্রচার করা হয়ে থাকে তবে অবশ্যই তৈমুর থেকে ঔরঙ্গজেব কেউই সাচ্চা মুসলমান ছিল না। অথবা ইসলামের ইতিহাসে যেসব যুদ্ধবাজদের কথা আমরা পড়ি তারা কেউই পবিত্র কোরান পাঠ করেনি। জেরুজালেমের অধিকার নিয়ে মধ্যযুগে যে ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ হয়েছিল সেখানে সহাবস্থান সহমর্মিতার নামগন্ধ খুঁজে পাওয়া যায় না। সোজা কথায়, ইসলাম কোনোদিনই শান্তির বার্তা দেয়নি। ইসলাম হিংস্রতাকেই প্রশ্রয় দিয়েছে। সমর্থন করেছে। ইসলামের এই অবাধ হিংস্রতার জন্যই আমরা প্রাচীন নালন্দা মহাবিদ্যালয়কে চিরতরে হারিয়েছি। ভারতে হিন্দুদের তীর্থক্ষেত্র ও মন্দির অসংখ্যবার আক্রান্ত হয়েছে। যেসব আল্লার বান্দা মুসলমান শাসকেরা এই বর্বরতার নায়ক ছিল তারা কী কেউ কোরান পড়েনি, জানতে ইচ্ছা করে। এত যুগ পরে কীভাবে কিছু বাঙালি আঁতেল বুদ্ধিজীবী হঠাৎ আবিষ্কার করলেন ইসলাম শান্তি ও সম্প্রীতির প্রতীক।

বাংলাদেশে জেহাদি হামলা যারা চালিয়েছে তারা আই এস অথবা জামাতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশের অনুগত কিনা তা নিয়ে জোর তরজা চলছে। এই বিতর্ক অনর্থক। কারণ, দুনিয়ার সমস্ত কট্টর

গূঢ় পুরুষের কলম

মৌলবাদী মুসলমান সংগঠনের লক্ষ্যই হচ্ছে ইসলামের শরিয়তি শাসন প্রতিষ্ঠা করা। তাই জেহাদি সংগঠনের পরিচয় থেকে বেশি প্রয়োজন তাদের রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া। জানতে হবে কেন সন্ত্রাস মুসলমান পরিবারের উচ্চশিক্ষিত তরুণরা জেহাদের ডাকে ঘর ছাড়ছে। কারণ, এই বিভ্রান্ত তরুণেরা তাদের জীবনে মসজিদে গিয়ে নমাজ পড়েছে এমন কোনো তথ্য তাদের পরিবারের কাছ থেকে পাওয়া যায়নি।

বাংলাদেশের এই ঘরছাড়া তরুণেরা ইংরেজি মাধ্যম খৃষ্টান মিশনারি স্কুল ও কলেজে পড়াশুনা করেছে। ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে ধর্মীয় গোঁড়ামি তাদের ছিল না। তবুও তারা কেন জেহাদি জঙ্গি হয়েছিল এই প্রশ্নটা আমাকে অন্তত ভাবাচ্ছে। ভারতে বহু মুসলমান তরুণ ও যুবক বাড়ি ছেড়েছে জেহাদের ডাকে। যেমন, কেরলে গত একমাসে বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়েছে কমপক্ষে ১৫ জন মুসলমান তরুণ। প্রত্যেকেই অবস্থাপন্ন বাড়ির এবং উচ্চশিক্ষিত। তাদের পরিবারের সন্দেহ যে তারা মধ্য প্রাচ্যের সিরিয়ায় চলে গেছে। সেখানে তারা যুদ্ধরত আই এস জঙ্গি শিবিরে যোগ দিয়েছে। কেন? হয়তো জেহাদের ধারণাকে কেন্দ্র করে তৈরি করা একটা রোমান্টিক বাতাবরণ তাদের প্ররোচিত করেছে আই এসের খাতায় নাম লেখাতে।

হ্যাঁ, কথাটা আমাদের ভাবাচ্ছে। কারণ, বাংলাদেশের ঘটনার ঢেউ সুনামি হয়ে ভারতের মাটিতে আঘাত হানতে পারে। সম্প্রতি কাশ্মীরে 'মোস্ট ওয়ান্টেড' জঙ্গি বুরহান ওয়ানির মৃত্যুকে ঘিরে যে হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেছে তা যথেষ্ট উদ্বেগজনক। কাশ্মীরে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে যে, সেখানের তরুণদের একটা বড় অংশ হিজবুল মুজাহিদিন এবং লস্কর-ই-তৈবার মতো জেহাদি সংগঠনে নাম লিখিয়েছে। বিশেষ করে দক্ষিণ কাশ্মীরের চারটি জেলা— পুলওয়ামা, অনন্তনাগ, কুলগাঁও এবং শোপিয়ানে ঘর পালানো তরুণদের সংখ্যা উদ্বেগজনকভাবে বেশি। নতুন প্রজন্মের দেশি জঙ্গিরাই এখন কাশ্মীরের নিরাপত্তা বাহিনীর কাছে প্রধান চ্যালেঞ্জ। সাম্প্রতিক জঙ্গি হামলার চরিত্র ও গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাচ্ছে যে ভারতের মাটিতে যে কোনো সময়ে বড় ধরনের হামলা হতে চলেছে। সমস্যা হচ্ছে, এতবড় একটা দেশে কোথায় কবে জেহাদি হামলা হবে তা আগাম বলা যায় না। হামলা রোখার দায় তাই শুধুই নিরাপত্তা রক্ষীদের বা প্রশাসনের নয়। সাধারণ মানুষকেও তাঁদের সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে এই দায়দায়িত্ব নিতে হবে। সন্দেহজনক গতিবিধি দেখলে পুলিশকে জানাতে হবে। তবে এই দায় সব থেকে বেশি ভারতের মুসলমান সমাজের। কারণ, জেহাদিদের কার্যকলাপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দেশের মুসলমানদের দেশভক্তি, মুসলমানদের বিশ্বাসযোগ্যতা। এটাই প্রকৃত সময় নিজেদের প্রমাণ করা যে দেশের সব মুসলমান জেহাদি নয়। ▌

‘আইসিস’ জেহাদিদের সন্ত্রাসে বিশ্ব আজ আতঙ্কিত

মেঃ জেঃ কে কে গঙ্গোপাধ্যায় (অঃবঃ)

বিগত কয়েক মাস যাবৎ বেশ কয়েকবার ইরাক সিরিয়া অথবা পশ্চিমী সংবাদ মাধ্যমে ইসলামিক স্টেটের খলিফা আবুবাকার আল বাগদাদির আহত হওয়ার সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু প্রতিবারেই এইসব তথ্য মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়েছে। ইসলামি স্টেট সেইসব খবরের সত্যতা যেমন স্বীকার করেনি, তেমনি মিথ্যা গুজব বলে কোনো তথ্য প্রকাশ করেনি।

মাত্র কিছুদিন আগে ইরাক থেকে পাওয়া তথ্য উদ্ধৃত করে পশ্চিমী দুনিয়া সকলকে জানায় এবার সত্যই আবু বাকার আল বাগদাদি মার্কিন বিমান আক্রমণে সিরিয়ার আল রাকার কাছে নিহত হয়েছেন। কিন্তু প্রতিবারের মতো ইসলামি স্টেট এবিষয়ে সম্পূর্ণ নীরবতা পালন করে চলেছে। এটা সহজ সত্য বাগদাদির মৃত্যুসংবাদ শুধুমাত্র ইরাক-সিরিয়া ইসলামি স্টেটই নয়, সারা দুনিয়ায় যারা ইসলামি স্টেটের হয়ে সন্ত্রাস করে বেড়াচ্ছে তাদেরও মনোবল ভেঙে দেবে। তথ্যের সত্যতা স্বীকার না করার এটা একটা যথেষ্ট বড় কারণ। আবার এই মৃত্যু সংবাদ মিথ্যাও হতে পারে।

মাত্র কিছুদিন আগে ইরাকবাহিনী ‘ফালুজা’ পুনরাধিকার করার উদ্দেশে ফালুজায় অভিযান চালিয়ে ছিল এবং অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছিল। ‘আইসিস’ সৈন্যরা পালিয়ে গিয়েছিল। অনেকটা অঞ্চল ইরাকি সৈন্যদের হাতে এসেছে বলে জানা যায়। ওই শহরের কয়েক হাজার মানুষও পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে বলে জানা যায়। তথ্যানুসারে ইরাকের সৈন্যবাহিনী সত্বরই সমস্ত ফালুজা দখলমুক্ত করে মাসুল মুক্ত করার জন্য অভিযানে নামবে। কিন্তু সেই তথ্যের সেইখানেই ইতি। বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে নতুন কোনো তথ্যই নেই। মার্কিন বিমানবাহিনী যারা ইরাক ও সিরিয়ার সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধে সাহায্য করছে, তারাও কোনো তথ্য দিতে পারছে না। যতদূর মনে হয় প্রাথমিক সফলতার পর ইরাকি সৈন্যবাহিনী আর বেশি দূর অগ্রসর হতে পারেনি।

অন্যদিকে, ফ্রান্সের পর আইসিসের সন্ত্রাসবাহিনী ফ্লোরিডায় সমকামীদের এক ক্লাবে হানা দিয়ে পঞ্চাশজনকে নিহত এবং ৫৩ জনকে আহত করেছে। একজনমাত্র যুবক এতবড় ঘটনা ঘটিয়েছে। তার পিতামাতা আফগানিস্তান থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করতে যান এবং সেখানেই এই যুবকের জন্ম এবং শিক্ষা। মার্কিন মুলুকের মুক্ত আবহাওয়া ও পরিবেশে বড় হয়ে উঠলেও তার মনে ধর্মীয় মৌলবাদ সহজেই প্রবেশ করেছে।

তার পিতা অবশ্য বলেছেন, তাঁর পুত্র স্বাভাবিক নয়, সহজেই তার মাথা গরম হয়ে যায়। তারপর তার ন্যায়-অন্যায়ের হুঁশ থাকে না। বিশেষ করে সে সমকামীদের সহ্য করতে পারে না। তাঁর প্রাক্তন স্ত্রী, যার সঙ্গে যুবকটির বিবাহ বিচ্ছেদ হয়েছে, তিনিও জানিয়েছেন, তাঁকেও বহুভাবে দৈহিক নিপীড়নের শিকার হতে হয়েছে। ক্রোধে সে জ্ঞানশূন্য হয়ে যায়। মার্কিন সুরক্ষা কর্মীরা প্রায় আড়াই ঘণ্টা প্রয়াসের পর তাকে নিধন করতে সক্ষম হন। এই ঘটনার পর মার্কিন রাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্য ও সংগঠনের পক্ষ থেকে মার্কিন অস্ত্র আইন নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সেখানে প্রায় ৮৮.৮ শতাংশ মার্কিন নাগরিকের ব্যক্তিগত অস্ত্র আছে এবং সবরকমের অস্ত্রই সহজলভ্য। বর্তমান পরিস্থিতিতে ধর্মীয় মৌলবাদী মানুষের পক্ষে যে কোনো স্থানে বহু মানুষের সহজ নিধন সম্ভব।

> ভারতের দুর্ভাগ্য যে, শান্তির আশায় ভারত ভূখণ্ড বিভাজিত করে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হলো, সেই পাকিস্তানই আজ ভারতের পরম শত্রু হয়ে উঠেছে।

আবুবাকার আল বাগদাদির ই-মেল বোধহয় বর্তমানে নীরব রয়েছে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু সংখ্যক যুবক যারা আইসিস-এ যোগদান করে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে চায়, বাগদাদি নামের আর এক ব্যক্তিকে মেল পাঠিয়ে জানতে চাইছেন তাদের কোথায় যেতে হবে? ইরাক ও সিরিয়ায় কার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে ইত্যাদি। এই ব্যক্তির নাম আইয়াদ আল বাগদাদি। ইউনাইটেড আরব এমিরেটে তাঁর জন্ম হলেও বর্তমানে শরণার্থী হিসেবে নরওয়ের অধিবাসী। তিনি এইসবই-মেলের কোনো জবাব দেননি। ভারতে পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে তিনি ই-মেলে যোগাযোগ করেছেন। ই-মেল আই ডি ও প্রেরিত তথ্য না পাওয়া পর্যন্ত ভারতে এইসব ব্যক্তিদের সন্ধান পাওয়া সহজ নয়। মুম্বই পুলিশ তদন্তে নেমেছে।

সুফলও ফলেছে। গোয়েন্দা বাহিনী হায়দরাবাদে ‘আইসিস’-এর একটা বড় চক্রের সন্ধান পেয়েছে। অন্যদিকে তুরস্কের ইস্তানবুল বিমানবন্দরে হানা দিয়ে আইসিস-এর সন্ত্রাসবাদীরা প্রায় ১৫০ জনকে হতাহত করেছে। এখনও পর্যন্ত ৫০ জন মৃত, বাকিরা মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে। এই সন্ত্রাসের ঘটনাটি হওয়ারই ছিল, শুধু ভাবছিলাম কবে এবং কোথায়? কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিমান হানার সহায়তায় ‘ফালুজা’ আক্রমণ করে বেশ সফলতা পেয়েছে ইরাকি বাহিনী। অন্যদিকে, আবু বাকার আল বাগদাদির মৃত্যুসংবাদ যার কোনো সত্যতা আজও স্বীকৃতি পায়নি, ইরাক-সিরিয়া ইসলামি স্টেটের তরফ থেকে একটা বড়-সড় সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটিয়ে তার জবাব আসবে, এটাই ধারণায় ছিল। ঘটনা প্রবাহে ইসলামি স্টেটে সন্ত্রাসবাদী সৈন্যদল এবং বিশ্বব্যাপী

তাদের মৌলবাদী কর্মীদের মনোবল ধরে রাখতে, আমার মনে হয় এই সন্ত্রাসের ঘটনা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফ্লোরিডায় সমকামীদের নাইট ক্লাবের হামলাও পাগলের কীর্তি বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আফগানি পিতামাতার সন্তান যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করে, পশ্চিমের উদার এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার পরিবেশে লেখাপড়া শিখে বড় হয়েও ধর্মীয় কট্টরবাদ ভুলতে পারেনি। সেখানেও তার গুলিচালনায় ৫০ জন মৃত এবং আরও ৫৩ জন গুরুতর আহত। যদিও তার পিতা এবং প্রাক্তন স্ত্রী তাকে মানসিক ভারসাম্যহীন বলেছেন।

সমস্ত বিশ্ব এখন এক সম্ভাব্য সন্ত্রাসের পরিবেশে দিন কাটাচ্ছে। যে কোনো স্থানে এবং যে কোনো সময়ে 'আইসিস'-এর সন্ত্রাসবাদীর হাত আঘাত করতে পারে, সমূহ নরহত্যা করাই এদের লক্ষ্য। এই অবস্থা চলতে পারে না।

ইরাক ও সিরিয়ার সৈন্য বাহিনীকে যুদ্ধ বিমানের সহায়তা দিয়ে অথবা যুদ্ধ বিশারদ পাঠিয়ে তাদের নির্মূল করা সম্ভব হবে না। প্রয়োজন শক্তিশালী পদাতিক বাহিনীর। সঙ্গে সাঁজোয়া বাহিনী এবং অন্য সাহায্যকারী অস্ত্র-উপকরণ, ওই অঞ্চলে পৌঁছিয়ে আইসিসের হাত থেকে সমস্ত অঞ্চল কেড়ে নেওয়া। এর জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের নীচে বিভিন্ন শক্তিধর রাষ্ট্র থেকে প্রয়োজনীয় সৈন্যদল, অস্ত্র উপকরণ জোগাড় করে উপযুক্ত সামরিক অধিনায়কদের নেতৃত্বে ইরাক সিরিয়ায় পাঠিয়ে দেওয়া। তাহলেই কয়েক মাসের মধ্যে ওই অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। তবে যুদ্ধ শেষ হবে না। ওই অঞ্চলে এবং বিশ্বের অন্য অঞ্চলে কঠোর সুরক্ষার ব্যবস্থা করে আইসিসের ইসলামি মৌলবাদী জঙ্গিদের ধর-পাকড় জারি রাখতে হবে। নতুবা নররক্তের এই স্রোত বন্ধ হবে না।

অনেক প্রশ্ন করেছেন, এই সন্ত্রাসের বাতাবরণ থেকে ভারত কীভাবে নিজের সুরক্ষা কায়েম রাখবে। এটাই ভারতের দুর্ভাগ্য যে, শান্তির আশায় ভারত ভূখণ্ড বিভাজিত করে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হলো, সেই পাকিস্তানই আজ ভারতের পরম শত্রু হয়ে উঠেছে। একদিকে লস্কর-ই-তৈবা এবং জয়েস-ই-মহম্মদের মতো কট্টর মৌলবাদী জেহাদি সংগঠন ফেদাইন জঙ্গি পাঠিয়ে সরকারি সমর্থনে ভারতবাসীর রক্ত প্রবাহিত করছে। অন্যদিকে আইসিসের ধর্মীয় মৌলবাদীরা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে সন্ত্রাসের ছক কষছে। ভারতের গোয়েন্দা বাহিনীকে অভিনন্দন জানাই--- তাঁরা হায়দরাবাদে সাতজনকে প্রচুর অস্ত্র, আই-এ-ডি, ১৫ লক্ষ নগদ টাকা, কিছু জালনোট সমেত সময়মতো ধরে ফেলেছেন, অন্যথায় ভারতের কোনো না কোনো অঞ্চলে এরা বড়সড় সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটাতে প্রস্তুত ছিল। এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে ভারতকে অনুপ্রবেশের সমস্ত পথ বন্ধ করে দিয়ে কঠোর নজরদারি চালাতে হবে। ভারত, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশে আই এস এবং বহু মডিউল কাজ করে চলেছে। ভারতে এই মডিউলগুলিকে খুঁজে বের করে নির্মূল করতে অনুপ্রবেশ রুখতে হবে। তবে শুধুমাত্র সুরক্ষা কর্মীদের দিয়ে একাজ হবে না। সাধারণ মানুষকে এ বিষয়ে সচেতন হয়ে সুরক্ষা বাহিনীকে তথ্য দিয়ে সাহায্য করতে হবে। কিছু সংখ্যক ইসলামিক মৌলবাদী এবং কট্টরপন্থী মানুষ ইসলাম ধর্মের বদনাম করেছে। বেশিরভাগ মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষই উদার এবং শান্তিপ্রিয়। এই মানুষদেরই এগিয়ে আসতে হবে এবং সশস্ত্র কট্টরবাদীদের মুখোশ খুলে দিতে হবে। ফলে তাঁদের উপরও আঘাত আসবে। সেটাকে অগ্রাহ্য করতে হবে। কারণ আজ যখন জেহাদি অথবা চরমপন্থী আইসিস কোথাও আঘাত করে তখন সেখানে বহু মানুষ হতাহত হন। তাদের মধ্যেও মুসলমান সম্প্রদায়ের বহু মানুষ হতাহতের তালিকায় থাকেন।

ভারতকে সুরক্ষার দিক দিয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র হয়ে উঠতে হবে, যাতে কোনো প্রতিবেশী দেশ ভারতের উপর আঘাত হানার চিন্তাও করতে পারবে না। ছায়াযুদ্ধ চালিয়ে জঙ্গিদের 'ননস্টেট অ্যাক্ট' বলে পার পাবে না। পূর্বের সরকারি নীতি বিশ্বে ভারতকে দুর্বল রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিভাত করেছে। এখন ভারতকে মাথা উঁচু করে কঠোর অবস্থান নিতে হবে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে 'ইসলামিক স্টেট অফ ইরাক-সিরিয়া' (আই এস আই এস)-র বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযানের জন্য ভারতের যা কিছু করার প্রয়োজন করতে হবে। ধর্মীয় মৌলবাদ যেন ভবিষ্যতে বিশ্বে কোথাও মাথা তুলতে সক্ষম না হয়।

লেখাটি শেষ করার পরই ঘটনাপ্রবাহ সুনামির মতো আছড়ে পড়ল। গত ১, ২ জুলাই রাতে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার গুলশান অঞ্চলে, যেখানে বিদেশি দূতাবাসগুলি অবস্থিত এবং কূটনীতিকরা বসবাস করেন, সেখানে নয়জন সন্ত্রাসবাদী এক রেঁস্তরায় প্রবেশ করে প্রায় ৩৫ জনকে পণবন্দি করে। ২০ জনকে নৃশংসভাবে হত্যা করে আর ২ জন পুলিশ অফিসার বাধা দিতে গিয়ে নিহত হন। রাত্রি ন'টার পর ঘটনার সূত্রপাত এবং বাংলাদেশের সুরক্ষাবাহিনী ও সামরিকবাহিনী পরদিন ভোর প্রায় চারটের সময় ছ'জন সন্ত্রাসবাদীকে নিকেশ করে, একজনকে জীবন্ত গ্রেপ্তার করে ১৩ জনকে অক্ষত উদ্ধার করতে সমর্থ হন। প্রথম থেকেই আইসিস ঘটনার দায়িত্ব স্বীকার করলেও পরবর্তী বিশ্লেষণে মনে হয় বাংলাদেশের বিভিন্ন কট্টর ধর্মীয় মৌলবাদী গোষ্ঠী এবং পাকিস্তানের আই এস আই এই সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটিয়েছে। যদিও পাকিস্তান তা অস্বীকার করেছে। নিহতদের অধিকাংশই বিদেশি নাগরিক। অন্তত বাংলাদেশ সরকারের এমনটাই বিশ্বাস। দু'জন সন্ত্রাসবাদী পালাতে সক্ষম হয়। এই ঘটনার একদিন পর ৩ জুলাই রবিবার আইসিস বাগদাদে দুটি সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটায়। দুটিই শিয়া অধ্যুষিত অঞ্চলে। মাত্র কিছুদিন আগে ইরাক ফালুজা আক্রমণ করে পুনরাধিকার করে নেয়, এই জোড়া আক্রমণ তারই জবাব। সাম্প্রতিক অতীতে এতবড় সন্ত্রাসের ঘটনা এই প্রথম। অন্তত ১৩০ জন নিহত এবং আহত প্রায় ১৭০ জন। একই সঙ্গে নিউইয়র্কের এক পার্কেও গুলি চলে এবং এক ব্যক্তি নিহত হয় বলে জানা যায়। বাগদাদে প্রথম ঘটনার কয়েক ঘণ্টা পর দ্বিতীয় ঘটনা ঘটে, যার ফলে ৫ জন নিহত ও আহত ১৬ জন। সমস্ত বিশ্ব এই জঘন্য ঘটনার প্রতিবাদ করেছে। অনেকেই বলছেন clash of civilization সত্যই ঘটছে এবং বিশ্ব এক অন্ধকার যুগে প্রবেশ করছে। বিশ্বের শান্তিকামী সব মানুষকে এক হয়ে এই জঙ্গি ত্রাসের মোকাবিলা করতে হবে এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার শপথ নিতে হবে। ▌

সন্ত্রাসবাদীদের ধর্ম আছে এবং তা ইসলাম

অমলেশ মিশ্র

বর্তমান বাংলাদেশে বেশ কিছু সন্ত্রাসবাদী হামলার সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। কুফ্‌র হিন্দুদের হত্যা করা সেই সন্ত্রাসের লক্ষ্য।

২ জুলাই (২০১৬) ঢাকায় যে ঘটনা ঘটেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে সে দেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন— ‘‘যারা ধর্মে বিশ্বাস করেন, তারা কখনই এরকম কাজ করতে পারেন না। এদের কোনো ধর্ম নেই। এদের একমাত্র ধর্ম হলো সন্ত্রাস। রমজান মাসে

ইসলামি সন্ত্রাসবাদী, আই এস জঙ্গি।

একজন মুসলমান যাবে নামাজ পড়তে। আজান উপেক্ষা করে এরা গেল মানুষ খুন করতে। তাহলে কেমন মুসলমান তারা? কেমন ধর্ম তারা রক্ষা করে?’’ (বর্তমান ৩.৭.১৬ প্রথম পৃষ্ঠা)

প্রধানমন্ত্রী হাসিনা দেবীর প্রতি সম্পূর্ণ সৌজন্য রেখেই বলছি যে তিনি সম্পূর্ণ সত্য বলেননি। একথা ঠিক যে যারা ধর্মে বিশ্বাস করে তারা কখনও এরকম করতে পারে না। কিন্তু সন্ত্রাসবাদীরা একটি সম্প্রদায়ের। ধর্মের নয়। একথা ঠিক যে, রমজান মাসে হত্যা করা ওই সম্প্রদায়ের শাস্ত্রীয় অনুশাসনের বিরুদ্ধে। তবে একথা ঠিক নয় যে, এদের কোনো ধর্ম নাই। ইসলামকে প্রচলিত অর্থে ধর্ম বলা হয়ে থাকে (যদিও এটি একটি সম্প্রদায়) এবং এই সন্ত্রাসবাদীরা ওই সম্প্রদায়ের বা প্রচলিত অর্থে ওই ধর্মের।

একটি অতিশয় গুরুতর বিষয়কে লঘু করার জন্য এবং মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য নির্বাচনী সাফল্যের লোভে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক নেতারা, তথাকথিত বিদ্বজ্জনেরা ও সংবাদমাধ্যম নিরন্তর প্রচার করে করে এটিকে একটি প্রবাদ বাক্যে পরিণত করেছেন যে, সন্ত্রাসবাদীদের কোনো ধর্ম নেই।

প্রকৃত অর্থে ইসলাম বা খৃষ্টান কোনো ধর্ম নয়— সম্প্রদায় বিশেষ। তবে ইংরেজি ভাষায় রিলিজিয়ন শব্দটিকে ‘ধর্ম’ শব্দের সমতুল ধরে নিয়ে (ধর্ম এবং রিলিজিয়ন সমার্থক নয়) এগুলিকে ধর্ম বলা হয়ে থাকে। সেই অর্থে সন্ত্রাসবাদীদের অবশ্যই একটি ধর্ম আছে এবং তা ইসলাম।

ফলে সন্ত্রাসবাদীদের কোনো ধর্ম নেই নিরন্তর এই প্রচারে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা হয়ে চলেছে। এবং এই চেষ্টা এই ভারতবর্ষেই। অন্য কোনো দেশে ক্যানসারকে ক্যানসারই বলে, পেটব্যথা বলে চালিয়ে দেয় না। তারা তার চিকিৎসাও করে।

এখন পর্যন্ত যতগুলি সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের নাম জানা গেছে এবং যতজন সন্ত্রাসবাদী মারা গেছে বা ধরা পড়েছে— সবই ইসলামি সংগঠন এবং সকলেই মুসলমান।

সমস্ত মুসলমানই সন্ত্রাসবাদী নন— তর্কের খাতিরে একথা স্বীকার করে নিলেও তর্কের খাতিরে একথা স্বীকার করা যায় না যে সন্ত্রাসবাদীরা মুসলমান নয়।

এদের লক্ষ্য বিশ্বকে ইসলামায়িত করা বা ইসলামকে বিশ্বায়িত করা। এই লক্ষ্যপূরণে এই সন্ত্রাসবাদ একটি পথ। এপথে আদৌ বিশ্বকে ইসলামায়িত করা যাবে কিনা সে বিচার পরে। তবে যারা এই কাজটি করছে— তারা নিশ্চয় কোনো না কোনো সূত্র থেকে এই কাজের প্রেরণা পেয়েছে।

কেউ কেউ বলেন যে ইসলামি ধর্মগ্রন্থ কোরান শরিফের সুরা বকেয়ার ২৯ নং আয়ত থেকে এই প্রেরণা পাওয়া গেছে। ওই সুরায় ওই আয়তে বলা হয়েছে—

‘তিনি পৃথিবীর সবকিছুই তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন...’ এখানে ‘তিনি’ অর্থে

আল্লা এবং তোমাদের অর্থে মুসলমান ধরতে হবে। যেহেতু তিনি সব কিছুই মুসলমানদের জন্য সৃষ্টি করেছেন সেহেতু অমুসলমানরা জবর দখলকারী বলতে হয়। তাই জবর দখল উঠাতে সন্ত্রাসই ব্যবস্থা।

ইতিহাস উল্লেখ করছে যে মহম্মদ জীবিত থাকাকালেই কীভাবে মক্কা ও মদিনা ইসলামায়িত হয়েছিল। এখন সারা বিশ্বকে ইসলামায়িত করতে সন্ত্রাসবাদীরা যে পথ অবলম্বন করছে তা সম্ভব বা অসম্ভব সে বিচার আপাতত স্থগিত রেখে একথা বলা যায় যে, শ্রীমতী হাসিনা নিশ্চয় অবগত আছেন যে, মুশরিকদের (অমুসলমানদের) ইসলামি করানোর জন্য নানা কথা ও নানা পথের নির্দেশ দেওয়া আছে অসংখ্য আয়তে এবং সেগুলি নির্ভেজাল অনুরোধ নয়, রীতিমতো ভয় ও লোভ দেখানো।

ইসলাম ধর্মগ্রন্থ কোরান শরিফে ১১৪ টি সুরায় ৬১৪১টি আয়ত বা বাণী আছে। এগুলির মধ্যে অন্তত ৪১টি সুরায় এবং ১৪১টি আয়তে বলা হয়েছে কীভাবে মুশরিকদের সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে এবং কীভাবে তাদের ইসলামায়িত করতে হবে। ৬১৪১-এর মধ্যে ১৪১ সংখ্যার দিক থেকে নগণ্য হলেও ব্যঞ্জনার দিক থেকে নগণ্য নয়।

শ্রীমতী হাসিনা একজন ইসলামি হওয়ায় আমরা অনুমান করতে পারি যে তিনি নিজের সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে মোটামুটি ওয়াকিবহাল। ফলে পৃথিবীর একমাত্র সত্যধর্ম ইসলামে ধর্মান্তরিত করার বিষয়ে এবং অসুমলমানদের প্রতি কীরূপ ব্যবহার ও আচরণ করা হবে সে বিষয়ে শাস্ত্রীয় নির্দেশাবলী তিনি অল্পবিস্তার অবগত। তবুও তিনি কী করে বলেন— সন্ত্রাসবাদীদের কোনো ধর্ম নেই?

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ নামে সংগঠনটি তাদের লক্ষ্য হিসাবে ঘোষণা করেছে যে, তারা সারা বিশ্বকে আর্যায়িত করবে। তাদের কোনো বিশেষ শাস্ত্র বা ধর্মগ্রন্থ নেই। হিন্দু ধর্মগ্রন্থ ও শাস্ত্রসমূহ তাঁরা মেনে চলে। কিন্তু বিশ্বকে আর্যায়িত করার লক্ষ্যে তাদের কোনো জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদী সংগঠন আছে বলে জানা যায় না। আর বিশ্ব হিন্দু পরিষদ নামে সংগঠনটিও কোনো সন্ত্রাসবাদী সংগঠন নয়। হিন্দুধর্ম ও শাস্ত্রে--- ধর্মান্তরিত করার ব্যবস্থাও নেই। অনেককেই বলতে শোনা যায় যে, সন্ত্রাসবাদীরা ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা করছে। ইসলাম সন্ত্রাসে বিশ্বাস করে না, বরং মানুষ ও মনুষ্যত্বে বিশ্বাস করে। তাই যদি হয় তাহলে মুসলমান নেতৃবৃন্দ সন্ত্রাসবাদী সংগঠন ও তাদের সদস্যদের সেই কথা বুঝিয়ে বলার ব্যবস্থা নিন। তারা প্রচার করুন— জঙ্গিরা যা করছে তা ইসলাম অনুমোদিত নয়।

যে রাজনৈতিক নেতারা, তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা ও সংবাদমাধ্যম সেবীরা দিবারাত্র প্রচার করছেন— সন্ত্রাসবাদীদের কোনো ধর্ম নেই, তাঁরা মসজিদে মসজিদে গিয়ে মোল্লা-মৌলবি-ইমামদের ঘোষণা করতে বলুন যে সন্ত্রাসবাদ ইসলাম বিরোধী।

পৃথিবীব্যাপী সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কতই না সভাসমিতি, সম্মেলন, বক্তৃতা ও ব্যবস্থার কথা বলা হচ্ছে। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সব দেশকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টা নেওয়া হচ্ছে। সাধারণ দৃষ্টিতেই প্রতীয়মান হয় যে সন্ত্রাসবাদীদের ধর্ম আছে এবং প্রচলিত অর্থে সেই ধর্ম ইসলাম। শ্রীমতী হাসিনা যদি তা না মনে করেন তবে সন্ত্রাসবাদীদের বিচ্ছিন্ন করুন এবং বিশ্বব্যাপী এই প্রচেষ্টায় সহায়তা দিন। সমস্যাটিকে লঘু করে দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্তি করা বিধেয় নয়। ক্যানসারকে পেটব্যথা বলে চালিয়ে দিলে চিকিৎসা ঠিক হয় না। রোগী বাঁচে না।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

ভারতে সন্ত্রাসবাদের থাবা

বস্তুত ভারতে সন্ত্রাসবাদী জঙ্গি আক্রমণ ১৯৮৪ সাল থেকে প্রকট হয়েছে। '৪৮ সালেই তামিলনাড়ুর মীনমবক্কামে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ৩০ জন নিরপরাধ লোককে খুন করা হয়। আহত হয় ২৫ জন।

২০০১ থেকে ভারতে উল্লেখযোগ্য সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ

সাল	ঘটনা	হত	আহত
২০০১	২	৪৫	—
২০০২	৫	২০২	৪১৭
২০০৩	৪	৬৮	৩২
২০০৪	১	১৮	৪০
২০০৫	২	৮৩	৩০০
২০০৬	৩	২৬৭	৬২৫
২০০৭	৬	১৪৮	৭০
২০০৮	১১	৪০৯	১২৪৫
২০০৯	২	১৩	—
২০১০	২	১৮	১৯৯
২০১১	২	৩৮	২০৬
২০১২	—	২	৫
২০১৩	৮	৬৯	২৬৭
২০১৪	৫	১৭	৪৪
২০১৫	২	১৬	২৫
মোট	**৫৫**	**১৪১৩**	**৩৪৭৫**

১৯৯৩ সালে জঙ্গিরা বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে মুম্বইয়ে ৩৫০ জনকে হত্যা করে। ২০০১-এ ভারতের সংসদভবনে আক্রমণ চালালে ৭ জন নিরাপত্তারক্ষী প্রাণ হারান। ২০০২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর গুজরাটের অক্ষরধাম মন্দিরে জঙ্গি হামলায় ৩১ জন মানুষ প্রাণ হারান। ২০০৫ সালে দিল্লীতে ধারাবাহিক বিস্ফোরণে ৭০ জনের মৃত্যু হয়। আহত হন ২৫০ জন। ২০০৬ সালে মুম্বইয়ে ৭টি ট্রেনে ধারাবাহিক বিস্ফোরণে ২০৯ নিরপরাধ মানুষ প্রাণ হারান। ১৯৮৪ থেকে এখন পর্যন্ত ৬৪ বার সন্ত্রাসী হামলা হয়েছে ভারতে এবং ১৯২০ জন প্রাণ হারান। ▌

সন্ত্রাসে আক্রান্ত আমেরিকার অবস্থা চৌমাথার মোড়ে দাঁড়ানো দিশেহারা পথিকের মতো

নাইটক্লাব পালসে মতিনের ধ্বংসলীলা।

সন্দীপ চক্রবর্তী ।। অরল্যান্ডোর সমকামী নাইটক্লাব পালসে ওমর মতিন যে ধ্বংসলীলা চালিয়েছে তাতে আমেরিকা-সহ সারা বিশ্ব এখন উত্তাল। আমেরিকার রাজনৈতিক মহল মৌখিকভাবে ঘটনার নিন্দা করলেও, ইসলামি সন্ত্রাসের প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটনে সকলেই যে সমান তৎপর সেকথা বলা যাচ্ছে না। বস্তুত বর্তমান প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা এবং আসন্ন নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিলারি ক্লিনটন যে বিবৃতি দিয়েছেন তাতে স্পষ্ট তারা উদারপন্থী দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে ঘটনাটিকে অনাবশ্যক লঘু করে তুলছেন। বামপন্থীদের কাছ থেকে আজকাল কেউই বিশেষ কিছু প্রত্যাশা করে না। এক্ষেত্রেও করেনি। তাঁরা তাঁদের মতো আপেক্ষিক মন্তব্য করে দায় সেরেছেন। ব্যতিক্রম একমাত্র প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি এমন কিছু কথা বলেছেন যা আমেরিকা তো বটেই বিশ্বরাজনীতিতেও বড়ো একটা কেউ বলেন না।

আপাতত দেখা যাক আমেরিকার রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিক্রিয়া ঠিক কেমন। বারাক ওবামা এবং হিলারি ক্লিনটনের দল ডেমোক্রোটরা দায়ী করেছে মার্কিন সংবিধানের একটি ধারাকে। যে ধারায় নাগরিকদের আত্মরক্ষার জন্য আগ্নেয়াস্ত্র রাখার অধিকার দেওয়া হয়েছে। আমেরিকার বন্দুক লবি যথেষ্ট শক্তিশালী। রিপাবলিকানরাই মূলত এই লবির সমর্থক। ডেমোক্রাটদের যুক্তি, অবাধে বন্দুক কেনাবেচা করতে পারার জন্যেই দেশে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বাড়ছে। যুক্তিটা ক্লিশে! বস্তুত আমেরিকায় কোনো গণহত্যা হলেই ডেমোক্রাটরা কথাটা বলে। স্বাভাবিক ভাবেই রিপাবলিকানরা এই যুক্তি নস্যাৎ করে দিয়েছে। তাদের বক্তব্য, গত বেশ কয়েকবছর ধরেই আমেরিকা-সহ সারা বিশ্বকে ইসলামীকরণের (দার-উল-ইসলাম) কাজ চলছে। মতিন সেই প্রোগ্রামের অঙ্গ। ওয়াহাবিতন্ত্রই ইসলামি মৌলবাদের শেকড়। তাদের একমাত্র লক্ষ্য সারা পৃথিবীতে শারিয়া চালু করে একটি অখণ্ড ইসলামি বিশ্ব নির্মাণ। কিন্তু একথা ডেমোক্রাটরা বা বামপন্থীরা বুঝতে চায় না। অপরাধের 'মোটিভ' (উদ্দেশ্য) না খুঁজে তারা স্রেফ সেটা আইনশৃঙ্খলাজনিত সমস্যা হিসেবে দেখে লঘু করে দিতে চায়। আরও একটি প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেছে। কয়েকজন খৃস্টান যাজক কয়েক বছর ধরে লাগাতার সমকামীদের বিরুদ্ধে প্রচার চালাচ্ছিলেন। অনেকের ধারণা সেই প্রচারে উত্তেজিত হয়ে মতিন সমকামীদের আক্রমণ করেছে।

এদিকে নামি কয়েকজন সন্ত্রাস-বিশেষজ্ঞ অরল্যান্ডোর মতো ঘটনা বারেবারেই আমেরিকায় ঘটবে বলে সাবধান করে দিয়েছেন। দিনের পর দিন প্ররোচনামূলক কথাবার্তা বলে কাউকে মৌলবাদে বিশ্বাসী করে তোলা ইন্টারনেটের দৌলতে এখন অনেকটাই সহজ। তার ওপর আমেরিকার মধ্যবিত্ত সমাজ বর্ণ বা জাতিবিদ্বেষী তকমা লেগে যাওয়ার ভয়ে পাড়াপড়শির আচরণে অসঙ্গত কিছু দেখলেও এড়িয়ে যান। ঠিক যেভাবে কথায় কথায় হুমকি দেওয়ার বা ধর্মের জিগির তোলার প্রবণতা থাকা সত্ত্বেও মতিন যে প্রতিষ্ঠানে চাকরি করত সেখানকার কর্তৃপক্ষ আগাম ব্যবস্থা নেননি। নিলে সম্ভবত নাইটক্লাবের ঘটনা এড়ানো যেত। বিশেষজ্ঞরা বারাক ওবামাকে তাঁর অবশিষ্ট কার্যকালের মধ্যে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে একটি বলিষ্ঠ নীতি প্রণয়নের আর্জি

জানিয়েছেন। ওবামাও বলেছেন কঠোর হাতে সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলা করা হবে। কিন্তু মুশকিল হলো সন্ত্রাসবাদের পর্যালোচনায় ভারতীয় সেকুলারপন্থী নেতৃবর্গের দুর্বলতা মাঝে মাঝে আমেরিকাতেও প্রকট হয়ে ওঠে। তখন তারা কাঁটাকে কাঁটা বলতে ভয় পান। অযথা কুটো বলে বাড়তি সহানুভূতি প্রদর্শন করে বসেন। ডেমোক্রাটরা এখন তাই করছেন।

একথা অনস্বীকার্য ইসলামি মৌলবাদের গভীরতা মাপতে পশ্চিমি দুনিয়া এখনও পর্যন্ত ব্যর্থ। সন্ত্রাসের বলি হতভাগ্যের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। পশ্চিম এশিয়া এবং আফ্রিকা থেকে লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল শরণার্থী দলে দলে ইউরোপে চলে যাচ্ছেন। এখানে একটা কথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, শরণার্থীরা বেশিরভাগই মুসলমান কিন্তু তারা কেউই কোনো ইসলামি রাষ্ট্রকে বেছে নিচ্ছে না। এটা সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃত। পরিকল্পিতও বলা যায়। উদ্দেশ্য ইউরোপের জনবিন্যাসে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনা।

এই পরিস্থিতিতে আমেরিকার অবস্থা চৌমাথার মোড়ে দাঁড়ানো দিশেহারা পথিকের মতো। কিন্তু এভাবে বেশিদিন চলবে না। সে দেশের বর্তমান এবং ভবিষ্যত নেতৃবর্গকে খুব দ্রুত কর্মপন্থা নির্দিষ্ট করে ফেলতে হবে। ডেমোক্রাট এবং রিপাবলিকান নেতাদের একসঙ্গে বসে তৈরি করতে হবে পরিকল্পনা। এমন পরিকল্পনা যা জিহাদি সন্ত্রাসকে নির্মূল করে আমেরিকার সাধারণ মানুষকে নিরাপত্তা দিতে পারে।

কিন্তু কীভাবে? বারাক ওবামা বা হিলারি ক্লিনটন সম্প্রীতি রক্ষার কথা বলেছেন। ইসলামের উদারতা এবং বিশ্বপ্রেমে আস্থা রেখেছেন। ডোনাল্ড ট্রাম্প রাখেননি। তাঁর বক্তব্য, ইসলামের প্রকৃত স্বরূপ আমেরিকাকে প্রকাশ করতেই হবে। প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হলে তিনি যে মুসলমান শরণার্থীদের আমেরিকায় প্রবেশ বন্ধ করে দেবেন তাও জানিয়েছেন ট্রাম্প।

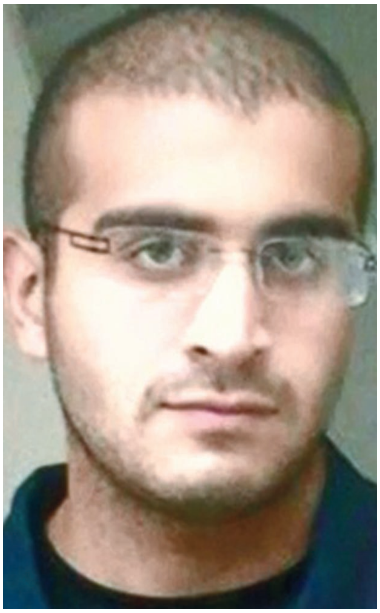

ধ্বংসলীলার নায়ক ওমর মতিন।

তিনি বলেছেন, 'আমরা যদি দ্রুততা আর বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কাজ না করতে পারি তা হলে আমেরিকা বলে কোনো দেশ আর থাকবে না।' এ কথার উপলক্ষ্য ওমর মতিন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মতিনের বাবা উগ্র তালিবান সমর্থক। আফগানিস্তান থেকে শরণার্থী হয়ে তিনি সপরিবার আমেরিকায় এসেছিলেন। ট্রাম্পের সাফ কথা, 'মতিন এতগুলো মানুষকে খুন করতে পারল কারণ একদিন আমরা তাদের এদেশে আসতে দিয়েছিলাম।' এই প্রসঙ্গে উঠে এসেছে মুসলমানদের আমেরিকায় নিষিদ্ধ করার কথা। ডেমোক্রাটরা তাঁর তীব্র সমালোচনা করলেও ট্রাম্প নিজের বক্তব্য থেকে সরে আসতে নারাজ। তিনি বলেছেন, 'আমি যদি নির্বাচিত হই তাহলে যেসব দেশ ইসলামি মৌলবাদের আঁতুড়ঘর হিসেবে পরিচিত সেখানকার একটি লোককেও আমেরিকায় ঢুকতে দেব না।'

আমেরিকার অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে দুই প্রধান দলের পরস্পরবিরোধী কথাবার্তা থেকে একটা জিনিস স্পষ্ট গোটা পশ্চিমি দুনিয়া এখনও দ্বিধায় ভুগছে। তারা মুখে উদারপন্থা এবং গণতন্ত্রের কথা বলে শরণার্থীদের আর্থিক সাহায্য করছে। আবার এই শরণার্থীদেরই কেউ কেউ আমেরিকার বদান্যতার সুযোগে ইসলামি মৌলবাদ ছড়িয়ে দিচ্ছে দেশের কোণে কোণে। ইন্টারনেটের বাড়বাড়ন্তের যুগে কোনো বিষয়ে প্রচার করা এখন খুবই সহজ। একের পর এক ওয়েবসাইট তৈরি হচ্ছে। ইসলামি মৌলবাদের প্রধান উদ্দেশ্য মধ্যযুগীয় নিয়ম কানুন প্রতিষ্ঠা করে পৃথিবীতে আবার খলিফার শাসন ফিরিয়ে আনা। বলা হচ্ছে, ইসলামই সারা পৃথিবীর সব সমস্যার একমাত্র সমাধান। ইসলামি আইন শরিয়া একবার চালু হলে মুসলমান অ-মুসলমানকে, পুরুষ নারীকে দাবিয়ে রাখতে পারবে। তাছাড়া, ইসলাম যদি একবার পৃথিবীর দখল নেয় তাহলে মুসলমানদের আর কোনো দুঃখ থাকবে না। খলিফার অধীনে তারা প্রত্যেকে বেহেস্তের জীবন কাটাতে পারবে।

এখান থেকে একটা জিনিস স্পষ্ট যে ইসলামে সাম্য বলে কিছু নেই। মৌলবাদী চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রগুলিও পরিষ্কার। এতকাল পশ্চিমী দুনিয়া ইসলাম-নিহিত এই চরমপন্থাকে বামপন্থার চরিত্রলক্ষণ হিসেবে বুঝতে চেয়েছে। তাত্ত্বিক বিচারে যা মোটেই অসঙ্গত নয়। 'যে আমার সঙ্গে নেই সে আমার শত্রু'— একথা যেমন ইসলাম বা খৃষ্টধর্মে আছে তেমন বামপন্থী দর্শনেও আছে। কিন্তু আপাতত সমস্যাটা অন্যরকম। সম্ভাব্য সন্ত্রাসবাদী শরণার্থীর ছদ্মবেশে দরজায় দাঁড়িয়ে, এই অবস্থায় আমেরিকা কি তাদেরই তৈরি দানবের মুখোমুখি হবার ঝুঁকি নেবে? নাকি যেসব মুসলমান মৌলবাদে বিশ্বাস করেন না তাদের আবেগে সুড়সুড়ি দিয়ে মুখরক্ষা করবে? এ প্রশ্নের জবাব দেবে সময়। শেষে সবিনয়ে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই। সারা পৃথিবীত যেভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে ক্ষোভ আর অসন্তোষ বাড়ছে তাতে মাঝে মাঝে মনে হয় ইসলাম আদৌ থাকবে তো? জিহাদিরা যত মানুষ খুন করে তাদের বেশিরভাগই মুসলমান। কিন্তু দুর্ভাগ্য, তাতেও মুসলমানদের টনক নড়ে না। ▌

ফ্লোরিডা থেকে বাংলাদেশ ইসলামি সন্ত্রাসের পদচারণা

বিমলকৃষ্ণ দাস

ফ্লোরিডার ঘটনা শুধু আমেরিকা নয়, গোটা বিশ্বকে আর একবার নাড়িয়ে দিল। ওমর মতিন নামে এক উনত্রিশ বছরের যুবক অরল্যান্ডোর 'পাল্‌স' নাইটক্লাবে পঞ্চাশজন ব্যক্তিকে গুলি করে হত্যা করে। তিপ্পান্নজন গুরুতর জখম। একদিন আগে ওই শহরেই এক কনসার্ট পার্টিতে পপ সঙ্গীত গায়িকা ক্রিস্টিনা গ্রিমিকে হত্যা করা হয়। মতিন পেশায় নিরাপত্তা রক্ষী। শরীরচর্চা করত, খুব মিশুকে ছিল না, নিয়মিত মসজিদে প্রার্থনায় যেত। তার প্রাক্তন স্ত্রী সিতোরা ইউসোফির মতে সে মানসিক দিক থেকে কিছুটা অসুস্থ, তাই বিয়ের দুমাস পরেই তারা আলাদা হয়ে যায়। পূর্ববর্তী জীবনেও তার বদমেজাজি রগচটা স্বভাবের কথা জানা গেছে। সমকামীদের প্রতি তার প্রচণ্ড ঘৃণা। আই এস জঙ্গিগোষ্ঠী দাবি করেছে যে সে তাদেরই লোক। প্রথম দিকে এ নিয়ে ধন্দ ছিল। আই এস-এর দাবি ছাড়া সেখানকার গোয়েন্দা বিভাগ এ প্রসঙ্গে কী কী প্রমাণ পেয়েছে তা সবার জানার কথা নয়। তবে সোজা বুদ্ধিতে বোঝা যায় এত বড় এক নৃশংস ঘটনা যে ঘটিয়েছে তাকে নিজের দলের লোক বলতে পারেন আই এস কর্তাদের সর্বাংশে লাভ, বিশেষ করে হত্যাকারী যেখানে মৃত। ভিন্ন অবস্থান হলেও ঠিক সমপর্যায়ের ঘটনা ঘটেছিল ১৪ ডিসেম্বর ২০১২। আমেরিকার মানুষ সেদিনও সমান স্তম্ভিত ছিল। অ্যাডাম ল্যানজা নামে বিশবর্ষীয় এক যুবক নিউটাউনের স্যান্ডিহুক এলিমেন্টারি স্কুলে অতর্কিতে একটি পিস্তল ও রাইফেল নিয়ে ঢুকে ২০টি শিশু ও শিক্ষিকা-সহ মোট ২৮ জনকে হত্যা করে। বাড়িতে মাকে হত্যা করে তার গাড়ি চালিয়ে আসে সে। নিজেও আত্মঘাতী হয়। এ ঘটনা শুনে রাষ্ট্রপ্রধান বারাক ওবামা কেঁদে ফেলেন। অ্যাডাম ল্যানজাও ছিল লাজুক প্রকৃতির, কারও সঙ্গে তেমন মিশত না। মনস্তত্ত্ববিদ্‌দের বক্তব্য— এটা অ্যাসপারজার সিনড্রোম। অন্তর্মুখী থেকে মানসিক ভারসাম্যহীনতা, অন্যের থেকে দূরে থাকা।

আমেরিকায় এর উপরে একটি জাতীয় বিতর্কে যে বিষয়গুলি কারণ হিসেবে উঠে এসেছিল তা হলো— খোলাবাজারে অস্ত্রের উপরে নিয়ন্ত্রণের অভাব, উগ্র ভিডিও গেম ও সেখানকার মিউজিক যা হত্যাকারীদের প্রভাবিত করে। বন্দুকবাজদের এমন ঘটনা আমেরিকায় প্রচুর। অন্যদেশেও ঘটছে। মতিনের ঘটনার পরেও বারাক ওবামা অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের পক্ষে জোরালো মত প্রকাশ করেন। আমেরিকা থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত বিশ্বজুড়ে এই যে সন্ত্রাস, হত্যার নানা নৃশংস কাণ্ড চলছে তা আফ্রিকার বোকোহারাম, আলকায়দা, আই এস যেই হোক না কেন প্রত্যেকের মধ্যে এক অদ্ভুত মিল আছে। প্রথমত, প্রত্যেকের ধারণা তার মতাদর্শের বা স্বার্থের যে পরিপন্থী তার পৃথিবীতে ঠাঁই নেই। অতএব তাদের হত্যা কর। হত্যার সঙ্গে সঙ্গে এক বড় উদ্দেশ্য থাকে--- বিভীষিকা সৃষ্টি, যার জন্য নৃশংসভাবে সাধারণ মানুষদের হত্যা। বিশ্বজুড়ে প্রতিপত্তি চাই। চেঙ্গিস খাঁ, নাদিরশাহ, মালিক কাফুর, কালাপাহাড় থেকে বর্তমানের নানা মাফিয়া ডন ইতিহাসে এদের অজস্র উদাহরণ। দ্বিতীয়ত, এরা অফুরন্ত অর্থের জোগান পায় বা অধিকারী হয়। এটাই তাদের শক্তির মূল উৎস। সম্প্রতি আই এস-এর রমরমার পেছনে রয়েছে কমপক্ষে ৪০টি দেশের পরোক্ষ আর্থিক সহযোগিতা, বেশ কয়েকটি তেল ভাণ্ডার এদের দখলে যা থেকে দিনে কোটি কোটি ডলার সংগ্রহ করে এরা। যার যত পয়সা তার তত ইচ্ছেমতো জমিদারি, অত্যাচার— এ তো পুরোনো কথা। তৃতীয় ধাপে এই অফুরন্ত অর্থ থেকে সংগৃহীত হচ্ছে অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র। অস্ত্র এরা কোথায় পায়! কোনো দেশ বা অস্ত্রসরবরাহকারী সংস্থা নিশ্চয়ই এদের অস্ত্র জোগান দিচ্ছে। চতুর্থত, মগজ ধোলাই। শৈশব থেকে বা পরবর্তীকালে ভ্রান্ত আদর্শের পাঠ পড়ানো। তাদের মনে ভিন্ন মতাবলম্বী মানুষের প্রতি প্রতিহিংসা, বিদ্বেষের বীজ বপন করা। কিছুদিন আগে কাগজে ছবি বেরিয়েছিল আই এস জঙ্গি শিবিরে তরোয়াল দিয়ে পুতুলের গলা কাটছে শিশুরা এমন প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

প্যারিসের থিয়েটার হলে নারকীয় ঘটনা বা ৯/১১-র ওয়ার্ল্ড ট্রেড টাওয়ার ধ্বংসের ঘটনা হোক্— তারপরে বোমারু বিমান সৈন্যবল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে বিভিন্ন দেশ এই নরখাদকদের উপরে। সফলতা মেলেনি তা নয়, তবে মোটেও সমাপ্ত হয়নি। তাই গোটা বিশ্বকে ওদের প্রাণভোমরা বধের কথা ভাবতে হবে। সমস্ত বিশ্বমিলে এদের অর্থজোগান, কীভাবে বন্ধ করা যায় তা ভাবতে হবে। এদের বিকৃত ভাবধারার নেটওয়ার্কে থাবা বসিয়ে মনুষ্যত্বের সদর্থক প্রচার করতে হবে। এক্ষেত্রে সকল ধর্মীয় গুরুদের ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। মস্তিষ্কে ভাব-বিকৃতির কারণে যেমন উগ্রপন্থী সৃষ্টি হয়েছে তেমনি সদর্থক প্রয়াসে এদের থেকে মূলস্রোতেও ফিরে এসেছে প্রচুর। তবে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই এই সব বৃত্রাসুরের সূতিকাগার তথাকথিত রাজনীতি। আজকের কোনো রাজনৈতিক হত্যা, রাজনৈতিক স্বার্থরক্ষায় অপরাধীর তোষণের মধ্যে আগামীকালের কোনো ভয়ঙ্করতার বীজ লুকিয়ে থাকতে পারে। এটা সকল রাজনীতিবিদদের বুঝতে হবে। মনে রাখতে হবে বিশ্বশান্তি কোনো অস্ত্রশক্তি বা আর্থিক শক্তির বিকাশের উপর নির্ভর করছে না, নির্ভর করছে মানুষের মধ্যের আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশের উপরে। আধ্যাত্মিকতা কোনো ধর্মীয় বিষয় নয়, আধ্যাত্মিকতা হলো ঈশ্বর বা সৃষ্টিশক্তির অখণ্ডত্ব, তাঁর সঙ্গে মানবপ্রাণ ও বিশ্বচরাচরের সকল প্রাণী ও বস্তুর সম্পর্কের নিবিড়তা ও মানব জাতির একাত্মতা— তাঁর অনুভূতি। ▌

বাংলাদেশে কংগ্রেস, কমিউনিস্ট নেই, পশ্চিমবঙ্গেও থাকবে না

চিঠিপত্র

স্বস্তিকার ২০ জুন ২০১৬ সংখ্যায় 'বাংলাদেশকে হিন্দুশূন্য করার লক্ষ্যে চলছে হিন্দু নিধন' প্রসঙ্গে কয়েকটা কথা না বলে নীরব থাকা সম্ভব হলো না। বাংলাদেশ কি হিন্দুশূন্য হতে চলেছে? এরকম কথা একটা দৈনিক পত্রিকাতেও পড়েছিলাম। যদি খোঁজখবর নেন তবে দেখবেন মুসলমান দেশে এবং খৃষ্টান দেশে খৃষ্টপূর্ব ইসলামের স্বদেশি ধর্মাবলম্বীরা ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর সংখ্যায় এসে ঠেকেছে। কোথায় গেল ইউরোপের মূর্তিপূজার প্যাগান ধর্মাবলম্বীরা? মিশরের ও রোমের মন্দিরে মন্দিরে যে পূজার্চনা হোত খৃষ্টপূর্ব দুনিয়ায় সেই পূজাপদ্ধতি কী প্রক্রিয়ায় বিনাশ করা হলো? তৃতীয় খৃষ্টাব্দে সম্রাট কনস্টেনটাইন ইউরোপ অধিকার করার পর প্রথম খৃষ্টান সম্রাট প্যাগানদের ধর্মাচরণ, মূর্তিপূজার উপরে নানা বিধিনিষেধ আরোপ করতে থাকলেন, মন্দির লুঠ চলল, নতুন মূর্তি মন্দিরে স্থাপন বন্ধ করা হলো। অপরদিকে সাম্রাজ্যের সর্বত্র চার্চ ও হলঘর তৈরি করা হলো। ধর্মান্তরণের কাজে রত মিশনারি, পাদরিরা রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় সুযোগ-সুবিধা পেতে থাকল। মূর্তিপূজারিদের মন্দির পরিত্যক্ত করার ব্যবস্থা হলো, ধর্মান্তরকরণের জোয়ার শুরু হলো। খৃষ্টানদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং প্যাগানদের জনসংখ্যা হ্রাস করে করে তিনশো বছরের মধ্যে প্যাগান ইউরোপ খৃষ্টান ইউরোপে পরিবর্তিত হয়েছিল। মাত্র তিনশো বছরের মধ্যে মূর্তিপূজারিদের ধর্ম, সংস্কৃতি, রীতিনীতি এবং জাতিসত্তা বিনাশ করা হলো। একটা জাতি ও তাদের সভ্যতা বিলুপ্ত করল এক জাতি। খৃষ্টত্বে ব্যাপটাইজ করার নির্দেশ আছে (বাইবেল ২৮/১৮-১৯)। খৃষ্টান হলেই ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানো যাবে। ব্যাপটাইজ হওয়া চোর ডাকাতও ঈশ্বরের কাছে পৌঁছবে। কিন্তু মূর্তি পূজারি প্যাগান সৎলোক হলেও পৌঁছতে পারবে না ঈশ্বরের কাছে। আর একটা মজার ব্যাপার হলো ১১৮টি সংখ্যাগুরু খৃষ্টান রাষ্ট্রের (মোট ১৯৫টি রাষ্ট্র) একটির সংবিধানেও 'ধর্মনিরপেক্ষতা' লেখা নেই। যেমন মিশনারিদের উদ্দেশ্য পৃথিবীর সব মানুষকে খৃষ্টান করা তেমনি মৌলবিদেরও উদ্দেশ্য রাষ্ট্রের সব মানুষকে মুসলমান করা। ইসলামি রাষ্ট্রের আদর্শ হলো সমস্ত লোককে ইসলামে বিশ্বাসী করা ('The conversion of entire population to Islam and the extinction of all kinds of dissent is the ideal of Islamic State.–J.N. Sarkar) বর্তমান পৃথিবীর ৪টি মুসলমান রাষ্ট্রের ---সোমালিয়া, সৌদিআরব, মালদ্বীপ ও মরিশানিয়ার সব মানুষকেই মুসলমান করা হয়েছে। (উল্লেখ্য, জন্ম থেকে মানুষ হিন্দু। হিন্দুকরণ করতে হয় না। কিন্তু মুসলমান করা হয়ে থাকে)। ৫টি মুসলমান রাষ্ট্রের শতকরা প্রায় ১০০ শতাংশ মানুষকে মুসলমান করা হয়ে গেছে। যেমন— আফগানিস্তান, ইয়েমেন, তুরস্ক, মরক্কো ও পশ্চিম সাহারা। ২০১২ সালে ৫০টি মুসলমান রাষ্ট্রের মধ্যে ২৫টি-তে ৯০ থেকে ১০০ শতাংশ মুসলমান। এখন ৫২টি মুসলমান রাষ্ট্র। অ-মুসলমানরা, বিশেষত হিন্দুরা যাতে তাদের ধর্ম পালন করতে না পেরে ইসলাম গ্রহণ করে অথবা দেশছেড়ে চলে যায় উদ্বাস্তু হয়ে সেই চেষ্টাই চালানো হয়। তারা চলে গেলে সেই জমিতে ধীরে ধীরে মুসলমানদের ভোগ দখল কায়েম হবে।

বাংলায় ১২০৪ সালের আগে মুসলমান সমাজ সংগঠিত ছিল না। ১২০৪ সালে বক্তিয়ারের বাংলা দখলের পর ধর্মান্তর শুরু। ১২০৪ থেকে ১৭৫৭ সাল পর্যন্ত (৫০০ বছর) মুসলমান শাসন। ১৮৭২ সালে বাংলায় প্রথম জনগণনায় দেখা গেল ১৫টি জেলায় (মোট ৩১টি জেলা) মুসলমানরা সংখ্যাগুরু। ১৯৪৭ সালে যে যে জেলায় মুসলমান সংখ্যাগুরু সেই সেই জেলার জমিতে সৃষ্টি হলো পূর্ব পাকিস্তান। ৪৭ সালের পর থেকে উদ্বাস্তুরা ভারতে বিশেষত এই পশ্চিমবঙ্গে এসে আশ্রয় নিল। পূর্ববঙ্গের জমি হিন্দুরা হারাল। মুসলমানরা পূর্বপাকিস্তান তৈরি করে নতুন জমি লাভ করল। কিন্তু সব মানুষকে মুসলমান করা তো বাকি। তাই ১৯৪৭ থেকে অত্যাচার চলেছে ও হিন্দুরা কমছে। কমানো চলছে। পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৫১ সালে হিন্দু ২২.০৫ ভাগ, ১৯৬১-তে ১৮.৫ ভাগ, ১৯৭৪-এ ১৩.৫ ভাগ, ১৯৮১-তে ১২.১৩ ভাগ; ১৯৯১-তে ১১.৬২ ভাগ; ২০০১-এ ৯.২; ২০১১-তে ৮.৫ এবং ২০১৬-তে আরও কমেছে। পুরোহিত হত্যা করলে কে পূজা করবে? হিন্দুর ধর্মাচারণ বন্ধ হবে। স্বেচ্ছায় কেউ মুসলমান হয় না। লাভজিহাদ, জমি, জীবিকা, প্রাণভয়ে বেশকিছু হিন্দু মুসলমান হয়ে যাবে। বাকিরা ভারতে আসবে। শেষে আগামী ৫ থেকে ৬ দশকের মধ্যে বাংলাদেশে হবে শতকরা ১০০ শতাংশ মুসলমানের দেশ। পূর্ববঙ্গের হিন্দুরাই ঠকেছে। হাজার বছরের পূর্বপুরুষের ভিটামাটি হারিয়েছে। উদ্বাস্তু হয়েছে। ঠকেও কি তারা শিখেছে?

তারা পশ্চিমবঙ্গে এসেছে। এখানে ১৯৫২ সালে মুসলমান শতকরা ১৯.৫ শতাংশ ছিল। ২০১১ সালে ২৭ হয়েছে। ১৬ সালে বেড়ে ৩০ শতাংশ হবে। একই প্রক্রিয়া চলছে। আজ পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা কংগ্রেস, কমিউনিস্ট, তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দিচ্ছে— যারা সংখ্যালঘু তোষণকারী। কয়েক দশক পরে যখন সংখ্যালঘু সংখ্যাগুরুতে পরিবর্তিত হবে তখন তো বাংলাদেশের হিন্দুর মতোই তাদের অবস্থা হবে— হয় মুসলমান হও অথবা পশ্চিমবঙ্গ থেকে উদ্বাস্তু হও। এখনই শুরু হয়েছে প্রচার, মোগলিস্তান, ছোটপ্ল্যাকার্ড অথবা দেওয়ালে পোস্টার। যেমন আজ আর কংগ্রেস, কমিউনিস্ট, হিন্দুমহাসভা বাংলাদেশে নেই, এই পশ্চিমবঙ্গেও থাকবে

না কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস, কমিউনিস্টরা। পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন তখন কারা ভোগ করবে? হিন্দুদের এমনই মগজ ধোলাই করা হয়েছে তারা দেখেও শেখে না, ঠেকেও শেখে না। শুধু শিখেছে তোয়াজ আর তোষণ করা— তাতে ভবিষ্যৎ প্রয়োজন মিটবে না।

—**সুশোভন সরকার,**
দমদম।

বাক্-স্বাধীনতার অপপ্রয়োগ

বাক্-স্বাধীনতা নিয়ে বেশ কিছুদিন সমাজের সর্বস্তরে ও গণমাধ্যমে চর্চা চলছে। 'স্বস্তিকা'-তেও কিছু মূল্যবান আলোচনা হয়েছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও নানা ভাবে বাক্ স্বাধীনতা নিয়ে যেসব ঘটনা ঘটে চলেছে, সেখানে দেশভক্ত নাগরিক হিসেবে দু-চার কথা বলা প্রয়োজন বলে মনে করি। গণতান্ত্রিক সমাজের বৈশিষ্ট্য নাগরিকদের দেশ ও রাষ্ট্রের যে-কোনো ব্যাপারে নিজের মত প্রকাশ করা। কিন্তু এই মত প্রকাশ দেশ ও রাষ্ট্রের স্বার্থের হানিকর কিছু হতে পারে না। দেশের সার্বভৌমত্ব সবার উপরে। কিন্তু সম্প্রতি ভারতবর্ষের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং বুদ্ধিজীবী নামধারী কিছু মানুষজন যে-ভাবে তাঁদের বক্তব্য তুলে ধরেছেন এবং আগামীদিনেও তাঁরা যেভাবে চলার আভাস দিচ্ছেন তা সম্পূর্ণ ভাবে দেশের সার্বভৌমত্বের বিরোধী। এ এক অদ্ভুত পরিস্থিতি। এই পুণ্যভূমি ভারতের মাটিতে, জলবায়ুতে ললিত-পালিত হব, অথচ 'অসহিষ্ণুতার' নাম করে দেশের প্রকৃত জাতীয়তাবাদী সরকারের প্রধানমন্ত্রী, অন্যান্য মন্ত্রী ও ভারপ্রাপ্ত সংস্কৃতিবান ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যা ইচ্ছে বলে যাব— এটা চলতে পারে না! দিক্‌ভ্রষ্ট, প্রগতিশীলতার নামধারী ছাত্র, যুবক ও তাদের মদতদাতাদের এবার সংযত হওয়া প্রয়োজন। সেই সঙ্গে যেসব প্রকাশ-মাধ্যম এই হঠকারীদের উজ্জ্বল গরিমায় প্রতিষ্ঠিত করছেন, তাঁদেরও সংবাদপত্রের মত প্রকাশের স্বাধীনতার যে অপব্যবহার হচ্ছে, সেই নিয়ে একটু ভাবনা-চিন্তা অত্যন্ত জরুরি। দেশের প্রকৃত স্বার্থকে অপমান করার অধিকার কারোরই নেই, সে তিনি যেই হোন না কেন।

যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ব জয় করে ভারতে ফিরলে কলকাতায় শোভাবাজার রাজবাটীতে স্বামীজীকে কলকাতাবাসীদের পক্ষে এক অভিনন্দন দেওয়া হয়। অভিনন্দনের উত্তরে স্বামীজীর ভাষণের সামান্য অংশ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। স্বামীজী বলছেন, 'মানুষ নিজের মুক্তির চেষ্টায় জগৎপ্রপঞ্চের সম্বন্ধ একেবারে ত্যাগ করিতে চায়, মানুষ নিজ আত্মীয়স্বজন স্ত্রী-পুত্র বন্ধু-বান্ধবের মায়া কাটাইয়া সংসার হইতে দূরে— অতি দূরে পলাইয়া যায়; চেষ্টা করে দেহগত সকল সম্বন্ধ— পুরাতন সকল সংস্কার ত্যাগ করিতে, এমনকী সে নিজে সার্ধ-ত্রিহস্ত-পরিমিত দেহধারী মানুষ, ইহাও ভুলিতে প্রাণপণ চেষ্টা করে; কিন্তু তাহার অন্তরের অন্তরে সর্বদাই সে একটি মৃদু অস্ফুট ধ্বনি শুনিতে পায়, তাহার কর্ণে একটি সুর— সর্বদা বাজিতে থাকে, কে যেন দিবারাত্র তাহার কানে কানে মৃদুস্বরে বলিতে থাকে, 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।' এই হল আমাদের দেশ— 'প্রকৃত ভারতবর্ষ।' তাই ভারতের এই মহামহিম চিত্রকে 'অসহিষ্ণুতার' নাম দিয়ে বা অন্য কোনোভাবে কালিমালিপ্ত করার প্রয়াস কখনও সফল হতে পারে না।

—**রণজিৎ সিংহ,**
কলকাতা-৭০০০৩৬।

নির্বিচারে পশুহত্যা

সম্প্রতি বিহারে ২০০ নীলগাই হত্যার ব্যাপারে পরিবেশ মন্ত্রী (বর্তমানে মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী) প্রকাশ জাভড়েকরের উপর পশুপ্রেমী মেনকা গান্ধী প্রচণ্ড চটেছেন। মেনকার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য জানাই যেভাবে নির্দয় ভাবে ভারতে মানুষের উদরপূরণের জন্য পশুহত্যা চলে তার একটি বিহিত হওয়া দরকার। এখানে হত্যা প্রক্রিয়াগুলির একটা বিবরণ দেওয়া হলো—

(১) গোরু জবাই— একটা নিরীহ গোরুকে বধ্যভূমিতে নিয়ে এসে একজন তার গলায় হাত বুলাতে থাকে, সেই সুযোগে চার জন তার চার পায়ে দড়ি বেঁধে ফেলে। তারপর একটা লোক হেঁচকা টান দিয়ে গোরুটিকে মাটিতে শুইয়ে ফেলে। চার পা বেঁধে একজন মাথাটা চেপে ধরে কসাই বিসমিল্লাহি রহমানে রহিম বলে গলায় ছুরি চালিয়ে দেয় আর সঙ্গে সঙ্গে রক্তবন্যা বয়ে যায়।

(২) শুয়োর হত্যা— ধরে এনে চার পা বেঁধে একটা লোহার সিক গরম করে তার বুকের উপর স্থাপন করে হাতুড়ি দিয়ে মেরে ফুসফুসটা ফুটো করে দেওয়া হয়, শুয়োরটা বিকট চিৎকার করতে থাকে।

(৩) কচ্ছপ হত্যা— জীবন্ত কচ্ছপের পিঠের শক্ত খোলাটা ধারাল ছুরি দিয়ে কেটে বের করে নেওয়া হয়। তারপর দেহের মাংস কেটে কেটে বিক্রি করা হয় আর কচ্ছপটা অসহায়ের মতো মানুষের দিকে তাকিয়ে থাকে।

(৪) মুরগি হত্যা— হিন্দু দোকানদাররা দুটো পাখা ধরে প্রথমে চপারের পেছন দিয়ে এক ঘা দিয়ে মেরুদণ্ডটা ভেঙে দেয় যাতে কাঠের গুড়ির উপর মাথা রেখে কোপ দিলে বেশি দাপাদাপি না করতে পারে। মুসলমানরা গলার নালি কেটে জবাই করে দেয়।

(৫) ছাগল, ভেড়া প্রকাশ্য স্থানে জবাই করা হয়, কারণ কসাইরা সবই প্রায় মুসলমান। ডেনমার্কে সংজ্ঞাহীন না করে কোনো পশু হত্যা করা হয় না। সুইডেন ও নরওয়েতেও এই আইন বহু আগে থেকেই চালু আছে। আমার আবেদন বুদ্ধ, মহাবীর এবং চৈতন্য মহাপ্রভুর দেশেও এই আইন পাশ হোক, যাতে পশুদের সংজ্ঞাহীন না করে হত্যা করা না হয়।

—**রবীন্দ্রনাথ দত্ত,**
কলকাতা-৬৪।

পরম্পরা

শ্রীগুরু পূর্ণিমা

ড. ইন্দ্রজিৎ সরকার

ভারতীয় সংস্কৃতিতে যে ক'টি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান রয়েছে তার মধ্যে 'শ্রীগুরু পূর্ণিমা' অন্যতম। ভারতীয় সংস্কৃতিতে শ্রীগুরু পূর্ণিমা উৎসবের একটি সুগভীর তাৎপর্য রয়েছে।

প্রত্যেক সভ্যতার নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে, যার সাহায্যে সেই সভ্যতার প্রকৃতি সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়। আর সেই বৈশিষ্ট্য প্রকাশক কিছু কিছু শব্দ

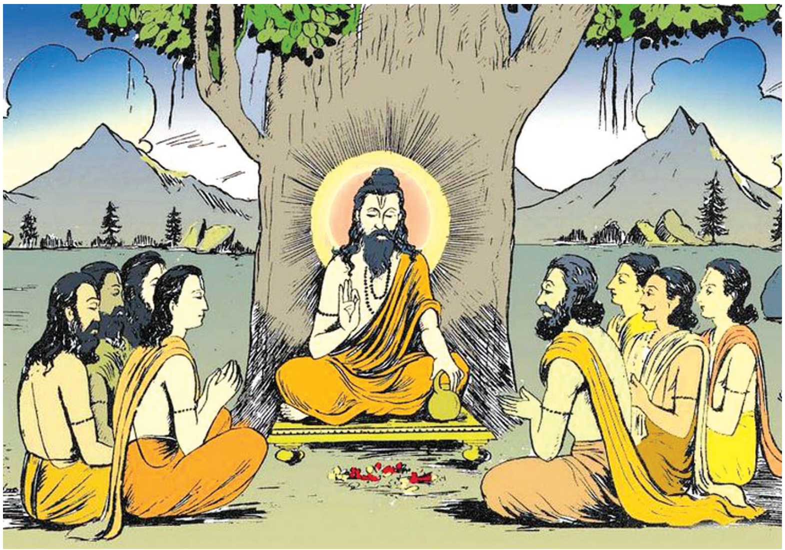

সেই সভ্যতার ভাষায় দেখা যায়, যেগুলির ভাষান্তর করা অসম্ভব। তেমনই একটি শব্দ 'গুরু', যা ভারতীয় সভ্যতার একটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করে। শব্দটির মাধ্যমে অধ্যাত্মপথের দিশারি থেকে শিক্ষক পর্যন্ত সকলকে নির্দেশ করলেও শব্দটির গভীর তাৎপর্যগত অর্থ আছে। দুর্ভাগ্যবশত আজ আমরা সেই অর্থটি বিস্মৃত হয়েছি। ছোটো মস্তান বড়ো মস্তানকে 'গুরু' বলে সম্বোধন করে। এই যে শব্দার্থের অবক্ষয় ভাষাবিজ্ঞানে যাকে 'অপকর্ষ' বলে, তার দ্বারা একটি জাতির সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের মাত্রা পরিমাপ করা যায়। যে শব্দের অর্থ একসময় ছিল অধ্যাত্মপথের দিশারি, আজ তার অর্থ 'বড়ো মস্তান'। এই অবক্ষয় জাতীয় সংস্কৃতির অবক্ষয়। হিন্দুধর্মকে আঘাত করতে গিয়ে আমরা জাতীয়তাকেই আঘাত করে বসেছি। আসলে আমরা ভুলে যাই যে, ভারতবর্ষে হিন্দুধর্ম ও জাতীয়তা সমার্থক— একে অন্যের পরিপূরক। আজ গুরু পূর্ণিমার প্রাক্কালে কথাগুলি সবাইকে ভাবতে হবে বৈকি।

'গুরু' শব্দটি ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির 'প্রতিভূ' স্থানীয় শব্দ। শব্দটি যে সংস্কৃত ভাষার অন্তর্গত তা আমরা সকলেই জানি। শব্দটির বর্ণ বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায়— গ + উ + র + উ + ঃ (বিসর্গ)। 'গ' বর্ণের সাহায্যে বুঝানো হয়— গময়তি অর্থাৎ গমন করানো। কোথায় গমন করানো? ব্রহ্মাভিমুখে। অন্য কেউ এই কাজটি করতে পারেন না। যিনি পারেন, তিনিই গুরু। গ-যুক্ত উকার বর্ণের অর্থ উচ্ছেদ। কীসের উচ্ছেদ? অজ্ঞান-অবিদ্যার। জীব অজ্ঞানবশত অনিত্য জাগতিক বস্তুর প্রতি আসক্ত হয়। গুরু সেই অজ্ঞানের উচ্ছেদ করে নিত্য-শুদ্ধ- বুদ্ধ-মুক্ত ব্রহ্মাভিমুখে শিষ্যকে গমন করান। 'র' বর্ণের অর্থ 'রসয়তি' অর্থাৎ আস্বাদন করানো। ব্রহ্মানন্দের আস্বাদন। কারণ ব্রহ্মানন্দ আস্বাদন না করলে পরব্রহ্মলাভ হয় না। 'র'-যুক্ত 'উ' কারের অর্থ 'উদয়'। পূর্ণ জ্ঞানের উদয়। আর বিসর্গের অর্থ— বিগত হয়েছে সর্গ (সৃষ্টি) যা থেকে। অতএব 'গুরুঃ' শব্দের তাৎপর্যগত অর্থ হলো— যিনি শিষ্যকে এই সৃষ্টি থেকে বিরত করে, পূর্ণ জ্ঞানের উদয় করিয়ে ব্রহ্মানন্দের আস্বাদন ঘটিয়ে অবিদ্যার উচ্ছেদ করিয়ে ব্রহ্মাভিমুখী অর্থাৎ ঈশ্বরাভিমুখী করেন— তিনিই গুরু। গুরু পূর্ণিমার পুণ্য তিথিতে একবার অন্তত গুরু শব্দের এই তাৎপর্যগত প্রাচীন অর্থটি স্মরণ করা প্রয়োজন।

ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতিতে 'গুরু' কথাটির একটি গভীর তাৎপর্য আছে। তিনি শুধু শিক্ষক নন, তিনি অধ্যাত্মপথের দিশারি। শিক্ষক ঐহিক জ্ঞানের পথপ্রদর্শক আর গুরু পারত্রিক জ্ঞানের— ব্রহ্মজ্ঞানের। প্রাচীন ভারতে শিক্ষা থেকে অধ্যাত্ম সব ক্ষেত্রে সুযোগ্য গুরুর প্রভাব দেশ ও জাতির উন্নতিতে সহায়তা করেছিল। এই গুরুকুলের হাত ধরেই ভারতবর্ষে সুবর্ণযুগের আগমন ঘটেছিল। দুঃখের বিষয় আজ আমরা সেই সব আলোকসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন গুরুকুল ত্যাগ করে হীনবীর্য জাতিতে পরিণত হয়েছি। এটাই ইতিহাস চক্র— Wheel of History, যা ব্যক্তিজীবন থেকে রাষ্ট্রীয় জীবন সর্বত্র ঘুরে চলেছে। যার অমোঘ পরিণাম মহামতি চাণক্য উপলব্ধি করেছিলেন— 'চক্রবৎ পরিবর্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ'। আজ আমরা ইতিহাসচক্রের নীচে পড়ে দুঃখের যাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছি। জানি না কবে সুখের জীবন আসবে। এই যে দুঃখের ফাঁদে পড়ে আজ কেঁদে মরছি তার কারণ গুরুকে আজ ত্যাগ করেছি। গুরু বলতে কেবল শিক্ষাগুরুকেই বুঝি। দীক্ষাগুরুকে উপেক্ষা করি। তাও শিক্ষাগুরুকে মান্য করি না; সম্মান করি না। উপরন্তু কেবল তাঁর নিন্দা করি; তাঁকে নির্যাতন, করে আনন্দ উপলব্ধি করি। সংবাদপত্রের পাতাগুলি আজ গুরু-নির্যাতন গুরু- লাঞ্ছনার কালিমায় লিপ্ত। বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় সর্বত্র উপেক্ষা, গুরু-লাঞ্ছনা। যত বড় বিদ্যালয় তত বেশি গুরু-লাঞ্ছনার বহর। শিক্ষাগুরু লাঞ্ছনার সঙ্গে ধর্মগুরু অধ্যাত্মগুরু এবং দীক্ষাগুরুর লাঞ্ছনা অহরহ চলছে। কিছু অপরিণামদর্শী জাতীয়তাবিরোধী, ভারতীয়

সভ্যতার বিনাশকারী, দেশদ্রোহী সুপরিকল্পিতভাবে আমাদের সভ্যতা সংস্কৃতি বিনষ্ট করার চেষ্টা করছে। তারা দেশীয় চিন্তা দেশীয় সভ্যতাকে নষ্ট করে বিদেশি সভ্যতার ধ্বজা উড়িয়ে নিজেদের প্রগতিশীলতার আগমার্কা প্রতিভূ বলে দাবি করছে। কিন্তু সাধু সাবধান! এই গুরু নির্যাতনের ফলে গুরুজন নির্যাতন বৃদ্ধি পাচ্ছে। অভিভাবকরা ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে যৌথভাবে শিক্ষাগুরু নির্যাতনে অংশগ্রহণ করছে। তার সঙ্গে প্রগতিশীল রাজনীতির ব্যাপারিরা তো আছেনই। ফলে, তাঁরাই আজ নিজ-নিজ পুত্র-কন্যার দ্বারা নির্যাতিত হচ্ছেন। কথায় বলে 'পাপ বাপকে ছাড়ে না।' ছাত্রছাত্রীরা স্কুল-কলেজ- ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষা-গুরু নির্যাতন করে যে পাপ সঞ্চয় করছে তার ফল তাদের বাপকেও ভোগ করতে হচ্ছে। বুড়ো বয়সে কেউ পুত্র-কন্যার অন্ন আস্বাদন করতে পারছে না। মরণকালে পুত্র-কন্যার হাত থেকে একবিন্দু জল পাচ্ছে না। আর মৃত্যুর পর কেউ পিতৃশ্রাদ্ধ মাতৃশ্রাদ্ধ করে না— কারণ 'ধর্ম তো আফিমের নেশা।' বর্তমান এই সামাজিক পরিস্থিতিতে শিশুরা যাতে গুরুজনদের শ্রদ্ধা করতে শেখে, পিতামাতাকে সম্মান করতে শেখে, শিক্ষাগুরুকে মান্য করতে শেখে, দীক্ষাগুরুকে দেবজ্ঞানে পূজা করতে শেখে, তারই জন্য শ্রীগুরু পূর্ণিমা উদ্‌যাপন। বর্তমান সমাজে গুরুশিষ্যের সম্পর্ক স্বাভাবিক করে তুলতে হলে গুরু বিষয়ে একটি পরিচ্ছন্ন ধারণা থাকা প্রয়োজন।

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতির পীঠপ্রতিম ব্যক্তিরা ছিলেন গুরু। গুরু বলতে সেযুগে শিক্ষাগুরু-দীক্ষাগুরু উভয়কে বুঝাত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষাগুরুই ছিলেন দীক্ষাগুরু। তাই আমাদের ভাষায় একটি শব্দ পাই 'শিক্ষা-দীক্ষা'। আমরা কথায় কথায় বলি— 'লোকটির শিক্ষা-দীক্ষা নেই।' শিক্ষা হলো অপরাবিদ্যা লাভ আর দীক্ষা হলো পরাবিদ্যা লাভ। পরাবিদ্যা হলো ব্রহ্মবিদ্যা। আর অপরা বিদ্যা হলো জাগতিক বিদ্যা। অর্থাৎ শিক্ষা ও দীক্ষা একই গুরু দান করতেন। এই গুরু ও গুরু পরম্পরা ব্যতীত ভারতের উন্নতি সুদূর পরাহত। ভারতীয় শিক্ষা পদ্ধতির নামই 'গুরুকুল'; যার মূল কথা হলো, সর্বদা গুরু সন্নিধানে থেকে অর্থাৎ গুরুগৃহে বাস করে বিদ্যাশিক্ষা করা। সর্বদা গুরুর কাছে থাকলে তবেই শিক্ষার্থী গুরুর ন্যায় গুণান্বিত হবে, ফলে উভয়েই উভয়কে সঠিকভাবে জানতে পারবে। ফলে বিদ্যার সঞ্চার, জ্ঞানের প্রসার সমুদ্রের কল্লোলের ন্যায় গুরু-শিষ্যের মধ্যে প্রবাহিত হবে। প্রসঙ্গত মনে রাখতে হবে, এই ক্ষেত্রে গুরুর যোগ্যতা যেমন সংশয়াতীত হবে, শিষ্যের আনুগত্যও তেমন বিশুদ্ধ হবে। গুরু-গুরুকুল-গুরুতত্ত্ব হলো ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির চাবিকাঠি। ভারতবর্ষে গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক যতদিন ঘনিষ্ঠ ছিল, গুরু শিষ্যকে পুত্রবৎ পালন করতেন, শিষ্য গুরুকে পিতৃবৎ শ্রদ্ধা করত, সম্মান করত, ততদিন ভারতবর্ষে সুবর্ণ যুগ ছিল। আজ সেই সম্পর্ক নেই— সুবর্ণযুগও অস্তমিত। আজ শিষ্যরা এই কথার অর্থ জানে না। ছাত্ররা এই শব্দটির অর্থ বোঝে না। শিষ্য শব্দের অর্থ যাকে শাসন করা যায়। আজ মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট শিক্ষকদের কঠোরভাবে শিষ্যকে শাসন করতে নিষেধ করেছেন। শাসন করলে শিক্ষকের জেল-জরিমানা হবে। সুতরাং সমাজ চায় না যে, শিষ্যদের শাসন করা হোক। তাই লাগামহীন, অশাসিত শিষ্যের দল কানহাইয়া কুমার, অনির্বাণ ভট্টাচার্য, উমর খালিদদের ন্যায় শত শত দেশদ্রোহীর জন্ম দিচ্ছে। আর ছাত্র কথার অর্থ হলো ছত্রের ভাব যার মধ্যে আছে। ছত্র কী? ছত্র হলো গুরুর দোষ-ত্রুটিকে আচ্ছাদন করে তাঁর গুণাবলী প্রকাশ করার ক্ষমতা। এই ক্ষমতা যার মধ্যে আছে, সেই প্রকৃত ছাত্র। কিন্তু বর্তমানকালের ছাত্রকুলের মধ্যে এই ক্ষমতা দেখা যায় না। বরং এর বিপরীত ঘটনাই সর্বত্র দেখা যায়। ছাত্রেরা আজ শিক্ষকের নিন্দায় মুখর; নির্যাতনে উল্লসিত।

গুরু-শিষ্যের নিবিড় সম্পর্ক আজ যেন 'সোনার পাথরবাটি'র ন্যায় অলীক অবাস্তব হয়ে উঠেছে। যতদিন না এই সম্পর্ক স্বাভাবিক হবে, ততদিন সমাজের বিকাশ স্তব্ধ হয়ে থাকবে। কারণ, আমরা জানি 'শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম্।' শ্রদ্ধা না থাকলে জ্ঞানলাভ হয় না। আর জ্ঞানলাভ না করলে সামাজিক উন্নতি ব্যাহত হয়। বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি সর্বদা 'হোক কলরব' চলতে থাকে তবে সেই সমাজেও সর্বদা 'হোক কলরব' চলবে। তাই গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক সহজ, স্বাভাবিক করে তুলতে উভয় পক্ষকেই সচেষ্ট হতে হবে। আর সর্বাপেক্ষা সচেষ্ট হতে হবে অভিভাবককে। কারণ, অভিভাবককে একটি কথা মনে রাখতে হবে শিশু তাঁর, শিশুকে মানুষ করতে হলে তাঁকেই প্রধান ভূমিকা নিতে হবে। ভলটেয়ারের ভাষায়— 'নিজের বাগান নিজেকে চাষ করতে হবে।' সুতরাং ছাত্র-শিক্ষক বিরোধে তিনি যদি নিস্পৃহ থাকেন তবে তাঁরই ছেলে ব্রেসিয়ার পরে বিক্ষোভ দেখাবে, স্যানিটারি ন্যাপকিন পরে বিপ্লব করবে আর প্রকাশ্য দিবালোকে উন্মুক্ত রাস্তায় সহপাঠিনীকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে চুমু খেয়ে প্রগতিশীলতার পরাকাষ্ঠা দেখাবে। সুতরাং ছাত্রছাত্রীর আসন্ন বিপদে অভিভাবকদের চুপ করে বসে থাকলে চলবে না। কারণ এই কথাটি দিনের আলোর ন্যায় পরিষ্কার যে, 'হোক কলরব' করতে গেলে তাঁর ছেলে-মেয়েটি উচ্ছন্নে যাবে।

আজকাল গুরু-শিষ্যের এই ক্ষতবিক্ষত সম্পর্কে একটু বিদেশি মলম লাগাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে— তার নাম টির্চাস্ ডে। অর্থাৎ 'জুতো মেরে গোরু দান'! সারা বছর শিক্ষকদের নির্যাতন করে শিক্ষকদিবসে একটু কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন। কিন্তু বিদেশি মলমে যে দেশি রোগ সারবে না তা কেউ বোঝে না। এরকম বছরের ৩৬৫ দিন কারও না কারও নামে উৎসর্গ করা হয়েছে— ফাদার্স ডে, মাদার্স ডে ইত্যাদি আরও কত কী! বাপ-মা ছেলেকে কষ্ট করে মানুষ করলেন। ছেলে ফুড়ুৎ করে উড়ে গেল বিদেশে। সেখান থেকে ফাদারস্ ডে, মাদারস্ ডে-তে বাপ-মা-কে একটা রঙিন কার্ড পাঠিয়ে দিল— সারা বছর এক বারও খোঁজ নিল না বাপ-মা কেমন আছে, কী করছে! এটাই আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার ফল। অথচ প্রাচীন ভারতের গুরুকুল শিক্ষাপদ্ধতির মূল মন্ত্র ছিল— 'পিতৃদেবো ভব। মাতৃদেবো ভব।'

শ্রীগুরু-পূর্ণিমা কী? কেন এই পূর্ণিমার

নাম 'শ্রীগুরু-পূর্ণিমা'? আমাদের শাস্ত্র, আমাদের ঐতিহ্য-পরম্পরা কী বলে দেখা যাক। আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা তিথিকে 'শ্রীগুরু-পূর্ণিমা' বলে। শ্রীগুরু পূর্ণিমাতে আদি গুরু শ্রীভগবান থেকে আরম্ভ করে নিজ গুরুদেব পর্যন্ত সকল গুরুকে অর্থাৎ গুরু পরম্পরাকে পূজা করতে হয়। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের দুটি প্রধান শক্তি— সৃজনী ও উদ্ধারিণী। সৃজনী শক্তিদ্বারা তিনি জীব সৃষ্টি করেন আর উদ্ধারিণী শক্তি দ্বারা সেই জীবকে উদ্ধার করেন। এটাই তাঁর লীলা। জীবের প্রতি এটাই তাঁর অপার অহৈতুকী করুণা। এই উদ্ধারিণী শক্তিই গুরুশক্তি তথা গুরু। গুরু তাই শুধু ব্যক্তি নন— শক্তি; ঐশ্বরিকী শক্তি। এই তত্ত্বই গুরুতত্ত্ব বা গুরুপরম্পরা। এই ঐশ্বরিকী শক্তি আষাঢ়ী পূর্ণিমায় গুরুরূপে পৃথিবীতে প্রথম আবির্ভূত হয়েছিলেন বলে এই তিথিকে 'গুরু-পূর্ণিমা' বলে। যেমন বৈশাখী পূর্ণিমাকে বলে বুদ্ধ-পূর্ণিমা। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিকে বলে কৃষ্ণাষ্টমী বা জন্মাষ্টমী। চৈত্রের শুক্ল পক্ষের নবমীকে বলে রাম-নবমী। পাতঞ্জল দর্শনের সমাধিপাদের পঁচিশ সংখ্যক সূত্রের ব্যাখ্যায় স্বয়ং বেদব্যাস বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন— 'তস্যাত্মানুগ্রহাভাবেহপি ভূতানুগ্রহঃ প্রয়োজনম্। জ্ঞানধর্মোপদেশেন কল্প প্রলয় মহা প্রলয়েষু সংসারিণঃ পুরুষান্ উদ্ধরিষ্যামিতি।' অর্থাৎ তাঁহার (ঈশ্বরের) নিজের কোনো প্রয়োজন না থাকলেও জীবের প্রতি অনুগ্রহ করা প্রয়োজন বলেই কল্প-প্রলয়-মহাপ্রলয় হতে জীবকে জ্ঞানোপদেশ দ্বারা উদ্ধার করব— অনুগ্রহই সেই প্রয়োজন। তাই আদিগুরু শ্রীভগবান গুরুশক্তিরূপে পরম্পরাক্রমে প্রত্যেক দেহে বর্তমান থেকে গুরু হয়ে আসছেন। পরম্পরাক্রমে দেহেরই পরিবর্তন হয়, কিন্তু গুরুশক্তি বা ভগবৎশক্তি একই থাকে। এইজন্য 'গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ' এই বলে প্রত্যেক শিষ্য তাঁর গুরুকে পরমব্রহ্ম জ্ঞানে প্রণাম করে থাকেন। এই গুরু পূর্ণিমার দিন প্রত্যেক গুরুর মধ্যে সেই আদিগুরু থেকে আগত গুরুশক্তি বা ভগবৎশক্তি বিশেষরূপে প্রকাশিত হয়। প্রত্যেক গুরুর শিষ্যগণ তাঁদের গুরুকে ওইদিন ভক্তিভরে পূজা করলে সাক্ষাৎ পরব্রহ্মস্বরূপ সেই আদি গুরুরই বিশেষ আশীর্বাদ ও কৃপালাভ করেন। তাই গুরু পূর্ণিমার দিন সকল সম্প্রদায়ের শিষ্যগণ নিজ নিজ গুরুদেবকে পূজা করে থাকেন। নিজ গুরুদেবের পূজা দ্বারাই আদি গুরু হতে আরম্ভ করে গুরুপরম্পরার সমস্ত আচার্যের পূজা করা হয়। জীবকে উদ্ধারের জন্য শ্রীভগবান স্বয়ং সর্বপ্রথম জ্ঞানোপদেষ্টা গুরুরূপে আবির্ভূত হয়ে শিষ্যে এমনভাবে গুরুশক্তির সঞ্চার করেছেন, যাতে অনন্তকাল পর্যন্ত ওই গুরুশক্তি ধারাবাহিকভাবে শিষ্যে সঞ্চারিত হয়। আবার সেই শিষ্য গুরু রূপে জীবসমূহকে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশের দ্বারা উদ্ধার করতে পারেন। এইভাবে গুরু পরম্পরা আবহমানকাল চলতে থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে শ্রীভগবান উদ্ধবকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন— 'এতাবান্ যোগ আদিষ্টো মচ্ছিষ্যৈঃ সনকাদিভিঃ।/ সর্বতো মন আকৃষ্য ময্যদ্ধাবেশ্যতে যথা।।' (১১/১৩/১৪)। অর্থাৎ সমস্ত বিষয় হতে মনকে আকর্ষণ করে যেরূপ সাক্ষাৎ আমাতে সমাহিত করতে হয়, সেই যোগ আমার শিষ্য সনকাদি ঋষিগণ তাঁদের শিষ্যকে উপদেশ করেছেন। সুতরাং গুরু-শক্তি শ্রীভগবান সনকাদি ঋষিমধ্যে সঞ্চার করেন। তাঁরা শিষ্য পরম্পরায় সেই শক্তি প্রবাহিত করেছেন। তাই একথা স্বীকার করতে হয় যে, আদিগুরু ভগবান স্বয়ং গুরুশক্তিরূপে ধারাক্রমে বিভিন্ন দেহে সঞ্চারিত হয়ে আসছেন। সুতরাং গুরুই শ্রীভগবান। আমাদের শাস্ত্র আমাদের ঐতিহ্য পরম্পরা এই কথাই বলে থাকে। সুতরাং নিষ্ঠার সঙ্গে গুরুপূজা করলে শ্রীভগবানেরই পূজা করা হয়।

শ্রীগুরু পূর্ণিমা সম্বন্ধে আর একটি ভ্রান্ত ধারণা বহু ব্যক্তির মনে রয়েছে। তা হলো, 'শ্রীগুরু পূর্ণিমার' অপর নাম 'ব্যাস পূর্ণিমা'। কারণ ব্যাসদেব ওইদিন জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাই ওইদিন আদি গুরু ব্যাসদেবের পূজা সব শিষ্য নিজ নিজ গুরু পূজার মাধ্যমে করে থাকেন। এই তথ্য সঠিক নয়; সর্বৈব ভুল। কারণ ব্যাসদেব জন্মগ্রহণ করেছেন বলে আষাঢ়ী পূর্ণিমা গুরু-পূর্ণিমা হয়নি। গুরু পূর্ণিমা ব্যাসদেবের জন্মের বহুকাল আগে থেকে প্রচলিত ছিল। ব্যাসদেবের জন্ম দ্বাপর যুগের শেষ ভাগে। তার পূর্বেও গুরু পূর্ণিমায় শিষ্যগণ তাদের নিজ নিজ গুরুকে পূজা করেছেন। এই বিষয়ে শাস্ত্র প্রমাণ হলো— দেবর্ষি নারদ ব্যাসদেবকে বলেছেন, পূর্বকালে তিনি দাসীপুত্র ছিলেন এবং চাতুর্মাস্য ব্রতীদের সেবা করতেন (শ্রীমদ্ভাগবত ১.৫.২৩)। এই চাতুর্মাস্য ব্রত গুরু পূর্ণিমায় গ্রহণ করতে হয়। সুতরাং তখনও (পূর্বকল্পে) গুরু পূর্ণিমার প্রচলন ছিল এবং শিষ্যগণ ওই দিন গুরুপূজা করত। গুরু পূর্ণিমা ও ব্যাস পূর্ণিমা একই দিনে হলেও কৃত্য ভিন্ন-ভিন্ন। গুরু পূর্ণিমা উপলক্ষে দীক্ষাগুরুতে আদিগুরু ঈশ্বরের পূজা এবং ব্যাসপূর্ণিমা উপলক্ষে কথাবাচকে ব্যাসপূজা করতে হয়। গুরু পূর্ণিমা ব্রজধামে 'মুড়িয়া পূর্ণিমা' নামে খ্যাত। এই দিন ব্রজবাসীগণ গিরিগোবর্ধনকে সাড়ম্বরে পূজা ও পরিক্রমা করে থাকে। কারণ গিরি-গোবর্ধনকে তারা শ্রীভগবান স্বরূপ জ্ঞান করে আর শ্রীভগবানই তো আদিগুরু। এটাই 'শ্রীগুরু পূর্ণিমা' উৎসবের প্রকৃত তাৎপর্য। এখন প্রশ্ন, আমরা গুরু-পূর্ণিমা উপলক্ষে নিষ্ঠার সঙ্গে, ভক্তিভরে শিক্ষাগুরু, দীক্ষাগুরুকে শ্রীভগবান রূপে পূজা করব, নাকি সারাবৎসর শিক্ষাগুরুকে নির্যাতন করে টিচার্স ডে-তে তাঁকে অবেহলাভরে একটুকরা কেক ছুঁড়ে দিয়ে কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করব কিংবা টিচার্স ডে-তে শিক্ষক-ছাত্র প্রীতি-ফুটবল খেলায় ফুটবলে লাথি মারার নামে শিক্ষককে লাথি মেরে মনের ঝাল মিটাব? ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এই প্রশ্নের উত্তর দেবে। প্রাচীন ভারতে গুরুশিষ্য মিলিতভাবে প্রত্যহ যে মন্ত্রটি আবৃত্তি করে অধ্যয়ন-অধ্যাপনা শুরু করতেন সেই পবিত্র মন্ত্রটি আমাদের স্মর্তব্য :

"ওঁ সহ নাববতু, সহ নৌ ভুনক্তু, সহ-বীর্যং করবাবহৈ।
তেজস্বিনাবধীতমস্তু, মা বিদ্বষাবহৈ।।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।"

—ব্রহ্ম (ঈশ্বর) আমাদের উভয়কে (গুরুশিষ্য) সমানভাবে রক্ষা করুন। উভয়কে সমভাবে বিদ্যাফল ভোগ করান। উভয়ে যেন সমান ভাবে বিদ্যালাভের সামর্থ্য সম্পাদন করতে পারি। আমাদের অধ্যয়ন বীর্যশালী হোক, আমাদের লব্ধ বিদ্যা সফল হোক। আমাদের আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক বিঘ্নের শান্তি হোক।

(শ্রীগুরু পূর্ণিমা তিথি উপলক্ষে প্রকাশিত)

ছোটদের কলমে

নবাঙ্কুর

কচুবনের পেতনি

রূপসা দেবনাথ, ষষ্ঠ শ্রেণী

আমি তখন খুব ছোট। ক্লাস টু-এ পড়ি। মায়ের সঙ্গে মামাবাড়িতে গেছি। আমার মামাবাড়ি গ্রামে। মাটির ঘর, কিন্তু বাড়িটা অনেক বড় এবং ছড়ানো। একদিকে শোবার ঘর, একদিকে

রান্নাঘর, একদিকে গোয়াল ঘর। গোরুও অনেক। গোটা বাড়িটা গাছপালা দিয়ে ঘেরা। আমার খুব ভালো লাগে। তাই স্কুল ছুটি হলেই মায়ের সঙ্গে সেখানে চলে যাই।

সেবার মামাবাড়ি যাওয়ার পরই বর্ষা শুরু হল। কী আর করা যায়! সারাদিন ঘরেই খেলা করি। আমার মামাতো ভাই টুকুন। সেও টু-এ পড়ে। খেলতে খেলতে একদিন ভাই আমাকে বলল— চল, পুকুরে নৌকা ভাসাই গিয়ে। আমি খুব ভালো কাগজের নৌকা বানাতে পারি। চটপট দু-খানা নৌকা বানিয়ে নিলাম। বাড়ি থেকে পুকুরটা একটু দূরে। বাগানের পিছনে। টিপটিপ করে দু-এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছিল। সন্ধ্যা হয়নি, তখনও কিন্তু মেঘের আড়ালে সূর্য ঢেকে রয়েছে। বাগানের অনেক জায়গায় আবছা অন্ধকার। আমি আর টুকুন জলে নৌকা ভাসাচ্ছি। খেলতে খেলতে কখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে খেয়ালই করিনি। আমি টুকুনকে বললাম, চল, ফিরে যাই। মা বকবে। আমার আসলে একটু একটু ভয় করছিল। সেটা তো আর বলা যায় না! দু-জনে বাগানের মধ্য দিয়ে বাড়ি ফিরছি। চারদিকে পোকা ডাকছে। এমন সময় দেখি, জঙ্গলের মধ্যে কে যেন বসে আছে। মাথায় ঘোমটা দেওয়া কোনো বউ। শুধু মাথা দোলাচ্ছে। অন্ধকারে মুখ, শরীরের কিছু দেখা যাচ্ছে না। কেবল মাথার দুলুনিটা বোঝা যাচ্ছে। আমার বুকটা ভয়ে কেঁপে উঠল। শক্ত করে টুকুনের হাতটা চেপে ধরে বললাম— দেখ টুকুন, ওখানে কে যেন বসে আছে। মাথা দোলাচ্ছে।

টুকুন ভয়ে ভয়ে বলল— দিদা বলেছে বাগানে সুন্দরীমালা পেতনি থাকে। চল পালাই। তখন আমরা দুজন প্রাণপণে দৌড়তে লাগলাম। পেতনিটা পাছে পিছন পিছন আসে, এই ভেবে আরও জোরে দৌড়তে লাগলাম।

দৌড়তে দৌড়তে আমরা দু-জন যখন বাড়িতে পৌঁছলাম, তখন আমাদের দেখে সবাই জিজ্ঞেস করতে লাগল— কী হয়েছে?

টুকুন হাঁপাতে হাঁপাতে বলল— বাগানে সুন্দরীমালা পেতনি আমরা দেখেছি। শুনে দিদা তো ওরে মাগো, বাবা গো করতে লাগল। মামা ধমকে বলল— কোথায় পেতনি? চল দেখি। মামার আমরা সবাই আবার বাগানে গেলাম। আমি মামাকে জায়গাটা দেখিয়ে দিলাম। পেতনি তখনও মাথা দোলাচ্ছে। মামা সেদিকে এগিয়ে গেল। আমি মাকে জড়িয়ে ধরে আছি।

কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে মামা হো-হো করে হেসে উঠলো। আমাদের চেঁচিয়ে বলল— আয় তোরা এগিয়ে আয়, তোদের পেতনি দেখাচ্ছি।

আমি তো কিছুতেই যাবো না। কিন্তু টুকুন এগিয়ে গেল। তখন আমারও সাহস হল। আমিও গেলাম। গিয়ে দেখি ওটা এটা কচুবন। একটা বড় কচুপাতা বাতাসে এদিক-ওদিক দুলছে। আমি সেদিন খুব লজ্জা পেয়েছিলাম। ▌

ভারতের পথে পথে

গঙ্গাসাগর

গঙ্গোত্রীর গোমুখ থেকে উৎপন্ন হয়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রমের পর গঙ্গানদী গঙ্গাসাগরে মিলিত হয়েছে। গঙ্গা ও সাগরের এই মিলনস্থল গঙ্গাসাগর নামে পরিচিত। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলায় একেবারে দক্ষিণে এই গঙ্গাসাগর। প্রতি বছর মকর সংক্রান্তিতে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু মানুষ পুণ্যস্নানের জন্য এখানে আসেন। সাধু-সন্তদের সমাগমে এই মিলনস্থল বিশাল মেলার রূপ নেয়। সাগরতটে কপিলমুনির আশ্রম ঘিরে বসে মিলনমেলা।

কথিত আছে, কপিল মুনির রোষে সগর রাজার ষাট হাজার পুত্র ভস্ম হয়ে যায়। তাদের পুনর্জীবনের জন্য ভগীরথ গঙ্গাকে মর্ত্যে নিয়ে আসেন। গঙ্গার স্পর্শে সগর রাজার পুত্ররা পুনর্জীবন লাভ করেন এবং শস্যশ্যামলা হয়ে ওঠে উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল। প্রাচীনকাল থেকে গঙ্গাসাগরকে তীর্থক্ষেত্র হিসেবে মানা হয়। জীবনে একবার হলেও গঙ্গাসাগরে স্নান করে ধর্মপ্রাণ মানুষেরা নিজেকে ধন্য বলে মনে করেন।

এসো সংস্কৃত শিখি

भवत: नाम किम्?	আপনার নাম কী? (পুং)
भवत्या: नाम किम्?।	আপনার নাম কী? (স্ত্রী)
मम नाम............?	আমার নাম
एष: मम मित्रं गणेश:	এ আমার বন্ধু গণেশ
एतस्य नाम श्रुतवान्?	এর নাম শুনেছেন?

ভালো কথা

পিকনিকে বিপদ

আমাদের পাড়া থেকে প্রতিবছর আমরা পিকনিক করতে যাই। এবছর গিয়েছিলাম আমাদের বাড়ি থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরের রসিকবিলে। সেখানে ঝিলের মধ্যে জঙ্গল আছে। জঙ্গলে সবাই ঘুরতে যায়। আমাদের রান্নার ব্যবস্থা হয়েছিল ঝিলের পাড়ে। সকালে পৌঁছানোর পরই রান্না শুরু হয়ে যায়। আমরা যে যার মতো বেড়াতে চলে গেলাম। কেউ মাঠে খেলছে। খেলার পর আমাদের পাড়ারই দু-জন দাদা স্নান করতে ঝিলে নামে। আমার থেকে ওরা বেশি বড় নয়। ওরা যে সাঁতার জানত না তা কেউ জানে না। তাই কেউ মানাও করেনি ওদের। হঠাৎই দেখি সবাই চিৎকার করছে। দাদা দু-জন জলে ডুবে যাচ্ছে। অথচ আমাদের এখানে জলে নামার মতো কেউ নেই। সবাই পাড়ে দাঁড়িয়ে চিৎকার করছে। তখন যে রাঁধুনিরা ছিল তারা জামা খুলে জলে ঝাঁপ দিল। তারপর সাঁতার কেটে গিয়ে দাদা দুজনকে তুলে আনল।

নীতীশ বর্মন, বক্সিরহাট, কোচবিহার

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) খ ন্দে ল বু
(২) শি র ল খ

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) শ ত পো ক্ত
(২) প অ কূ ন্ধ

৪ জুলাই সংখ্যার উত্তর

(১) অঙ্গনওয়াড়ি (২) দেওয়ালঘড়ি

৪ জুলাই সংখ্যার উত্তর

(১) আম্রপালী (২) গ্যালিলিও

উত্তরদাতার নাম

(১) ঋকদীপ কর্মকার, কালিয়াচক, মালদা (২) অরিত্র নন্দ, এগরা, পূর্ব মেদিনীপুর
(৩) অনুশ্রী হালদার, ট্যাংরা, কলকাতা-৪৬ (৪) সমন্বিতা সাহা, মঙ্গলবাড়ি, মালদা

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

কোন বিকাশের পথে চলেছে মেয়েরা?

সুতপা বসাক ভড়

মধ্যযুগ থেকে বাঙালি রমণীর সার্বিক স্থিতি অবলোকন করলে দেখতে পাওয়া যায় যে, বহিরাগত বিধর্মী শত্রুর আক্রমণ, দুর্ব্যবহার অত্যাচারে মহিলারা ক্রমশ পর্দানশিন হয়ে যায়। ফলস্বরূপ সম্পূর্ণভাবে পুরুষের অধীনস্থ হয়ে পড়ে। সেজন্য বাঙালি রমণীদের স্বাধীনতা, বিদগ্ধতা চাপা পড়তে থাকে। পুজাপাঠ, ঘর-সংসার এবং রূপ-সৌন্দর্য চর্চার মধ্যেই তাঁদের জীবনযাত্রা সীমিত হয়ে যায় বা যেতে বাধ্য হয়। ওই সময় তাঁদের জন্য বরাদ্দ ছিল বাড়ির চৌহদ্দিটুকুই। এর মধ্যেও তাঁরা ঘরোয়া শিল্পকর্মে নিজেদের সৃষ্টিশীলতার প্রমাণ রেখে গেছেন।

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর লেখা শুরু করেন অনিলা দেবী ছদ্মনামে। বাঙালি মেয়েদের তৎকালীন যে ছবি তাঁর রচনায় পাওয়া যায় তা মোটেই সুখকর নয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচনায় মহিলা চরিত্রের বৈচিত্র্য আছে। তবে বেশিরভাগ সাহিত্যিকের লেখনীতে মহিলাদের প্রায় একই প্রতিচ্ছবি দেখা যায়। পরবর্তীকালে নীহাররঞ্জন গুপ্ত, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নপূর্ণা দেবী, বাসন্তী, পাখীর মতো অমর চরিত্র সৃষ্টি করলেও তৎকালীন সমাজে মহিলাদের পরিস্থিতির বিশেষ কিছু পরিবর্তন দেখেননি, দেখলে তার প্রকাশ থাকত তাঁদের সাহিত্যকর্মে। বিমল রায় সতীর মতো চরিত্র সৃষ্টি করলেন, কিন্তু কড়ি দিয়ে যে জগৎ কেনা যায় না, তার প্রতিফলন আমরা পেলাম উপন্যাসের শেষ অধ্যায়ে।

অঙ্গনা

আশাপূর্ণাদেবীর রচনায় দেখতে পাই মহিলাদের কত একাগ্র চেষ্টা এগিয়ে যাবার। আবার এও দেখা যায় পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা কীভাবে তাদের অবরুদ্ধ করছে— এসবের মধ্যেই ফুটে উঠেছে তাঁর অমর কীর্তি প্রথম প্রতিশ্রুতি, সুবর্ণলতা, বকুল কথার বকুল। এর পরের বছরগুলো খুবই দ্রুতগতিতে কাটল। সমাজে অনেক পরিবর্তন এল। সামগ্রিকভাবে বেশিরভাগ মহিলা বিকাশের পথে চলতে শুরু করলেন। তাঁদের অধ্যবসায়, নিষ্ঠা প্রশংসার যোগ্য। এই সময় হঠাৎ হোঁচট খেতে হয় কোনো এক নামি বাঙালি চিত্রপরিচালিকা ও অভিনেত্রী পরিচালিত চলচ্চিত্রে একটি প্রধান নারী চরিত্রকে দেখে। একজন বাঙালি মধ্যবয়স্কা মহিলা নিজের সন্তানসম পুরুষের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত। এরপর এল বিদেশে বসবাসকারিণী আর এক ভারতীয় চিত্র পরিচালিকা তাঁর নিকৃষ্ট রুচির পরিচয় নিয়ে। বাঙালি বিধবাদের মধ্যে অনৈতিক সম্পর্ক খুঁজে বের করা তার নির্দেশিত চলচ্চিত্রের বিষয়।

বর্তমানে শিক্ষিতা মহিলাদের একাংশ সিগারেট, মদ, ড্রাগস, পুরুষসঙ্গী এমনকী মহিলাতে আসক্ত। গে, লেসবিয়ান শব্দগুলো কয়েকবছর আগেও উচ্চারণ করা হোত না; অথচ আজ বেশ কিছু শিক্ষিত বাঙালি মেয়ে এই সবের জোয়ারে নিজেদের ভাসিয়ে দিয়েছে। সম্প্রতি এক বান্ধবীর মেয়ে তার ফেসবুকে ঘোষণা করেছে যে, সে অন্য একটি মেয়ের সঙ্গে সম্পর্কে লিপ্ত। মার মাথায় হাত! বলতে পারেন, এ কোন বিকাশের পথে চলেছি আমরা? ▌

‘বিল্লদাকুঞ্জ’
কালিকাপুর, বোলপুর,
জেলা : বীরভূম
ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ / ৯২৩৩১৮৯১৭৯

সবার প্রিয়
বিল্লদা®
চানাচুর

জাতীয়তাবাদী বাংলা
সংবাদ সাপ্তাহিক
স্বস্তিকা
পড়ুন ও পড়ান

অতিথি কলম

যাবতীয় সমস্যার সমাধান কিন্তু হিন্দু-মুসলমান বাকযুদ্ধের মধ্যে পাওয়া যাবে না

তনবীর আলম

মহামতি সক্রেটিসের বিরুদ্ধে যখন দেশদ্রোহিতার অপরাধে বিচার চলছিল তখন তিনি একটি বাক্য বলেছিলেন, "An unexamined life is not worth living" অর্থাৎ যে জীবনধারা পরীক্ষিত হয়নি তেমন জীবন যাপন প্রায় মূল্যহীন। এই মূল ভাবনার ওপর দাঁড়িয়েই কিছু কথা বলব। আমি যে ধর্মীয় পরিবার ও সমাজে জন্মেছিলাম তা বর্তমানে কী স্তরে রয়েছে এটা বিচার করা জরুরি। 'Institutionalis-ing constitutional Rights' নামের সাম্প্রতিক গ্রন্থে অর্থনীতিবিদ আবু সালে শরিফ জানাচ্ছেন, উন্নয়নের প্রশ্নটি মধ্যবিত্ত মুসলমান সমাজের মধ্যে সেরকম সাড়া জাগায় না। গরিষ্ঠ সংখ্যক মানুষ উন্নয়নের কথা মাথাতেই আনে না। ব্যতিক্রম হিসেবে মুসলমান জনসংখ্যার বিশেষ করে দিল্লী, মুম্বই বা অন্য কোনো মেট্রো শহরের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র

> **কেবলমাত্র মুসলমান নেতারা সর্বদা মুসলমানদের কানে তারা বঞ্চিত অবহেলিত এই মন্ত্র দিয়ে তাদের মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখছে। দেশে দীর্ঘদিন লাগু থাকা মনরেগা (MGNREGA), খাদ্য নিরাপত্তা বা ইন্দিরা আবাস যোজনার মতো প্রকল্পগুলির সুফল কি মুসলমানরা ভোগ করেনি?**

অংশ হয়ত উন্নয়ন নিয়ে কশ্চিৎ কদাচিৎ এক-আধটা কথা বলতেও পারে। কিন্তু ব্যতিক্রম কখনই নিয়ম হতে পারে না। মনে রাখতে হবে বিগত ১৫ বছরে ভারতে মুসলমানদের নিয়ে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী ও নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে বড় ধরনের ধারণাগত পরিবর্তন ঘটেছে। এই পরিবর্তন কিন্তু মূলত এসেছে মুসলমানদের পরিচয়গতভাবে (এখানে সংখ্যালঘু কথাটির যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে)। দেশের সম্পদের ওপর সংবিধান স্বীকৃত কী অধিকার রয়েছে ও আইনি নিরাপত্তা পাওয়ার ক্ষেত্রে সংখ্যাগুরুর সঙ্গে সমতা অর্জনের পথ ধরে।

অত্যন্ত আক্ষেপের কথা, মুসলমান সমাজের মধ্যে চালু রয়েছে সেই প্রাচীনপন্থী ধ্যানধারণা। পরিবর্তনের কোনো আঁচ সেখানে লাগেনি। কেমন যেন এক বিগত সময়ের জালে অবরুদ্ধ। মুসলমানদের স্বল্পাংশের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তাস্তরে ইতিমধ্যে যে আমূল তোলপাড় ঘটে গেছে তার কোনো রেশ এই নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত সমাজের গরিষ্ঠাংশের মধ্যে পড়েনি।

একটি মনুষ্য সম্প্রদায় কী নিয়ে ভাবিত তার একটা ভাল আন্দাজ পাওয়া যায় তারা কার কথা শুনে চলছে, কাকে অনুসরণ করছে তার থেকে। তাদের আলাপ আলোচনার, তর্ক-বিতর্কের বিষয়বস্তুই বা কী? প্রধানত তারা কী বিষয়ের ভাবনায় নিজেদেরকে জড়িয়ে রাখতে ভালবাসে বা কী তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষার অভিমুখ? এখানে বলতে হবে মুসলমানরা দৈনন্দিন জীবনে তাদের সামাজিক ও ধর্মীয় নেতাদের কথা শুনেই চলে। সেরকম কোনো বড় সমস্যায় পড়লে তখনই কেবল তারা রাজনৈতিক নেতার দরজায় যায়।

এই প্রসঙ্গে আমি দেখেছি, আপনারাও পরখ করে দেখতে পারেন, মসজিদ, মাদ্রাসা, আলোচনাসভা, জলসা, এমনকী উর্দু পত্র-পত্রিকাগুলোতেও শুধুমাত্র প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়। আলাপ আলোচনার বিষয়বস্তুর বদলে মুসলমানরা যে কেবলই অবহেলিত, তারা যে বলির পাঁঠা এমন অভিযোগের পাহাড় ঘিরেই বিতর্ক চলতে থাকে। আর যেটি হয় তাহলো নিজ সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরে লালিত নানান ধর্মীয় খুঁটিনাটি বিতর্কিত বিষয় নিয়ে চুলচেরা বিচার যার বিষয়সংখ্যা অগুনতি। গোঁড়া ধর্মীয় বিধিগুলির পর্যালোচনা একটা চালু বিষয়। এ বিষয়ে বাজার চলতি টিভি চ্যানেলগুলিও কোনো সদর্থক ভূমিকা পালন করতে পারেনি। সেখানে যৌনতা উদ্রেককারী নায়িকার বদলে উন্নয়নের কথা তুলে ধরা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে হয়নি। ফলে মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক অবস্থানটা যে ঠিক কী তা নিয়ে আলোচনা ঝুলেই আছে। মুসলমান সংক্রান্ত আলোচনা বলতে অধিকাংশ সময়ই তিন তালাক, শরিয়া, ফতোয়া, সন্ত্রাসী হামলা, আইএস ইত্যাদি প্রান্তিক বিষয়গুলিই প্রাধান্য পায়। যেন মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা কেবলমাত্র এগুলিকে ঘিরেই আবর্তিত হয়।

কিন্তু মধ্যবিত্ত মুসলমানদের আলোচনার বিষয়বস্তু উন্নয়ন না হয়ে কেবলমাত্র ধর্মীয়

পরিচয়, জীবনের নিরাপত্তা বা সর্বোপরি নিজ ধর্মের অভ্যন্তরীণ চুলচেরা আচার বিচার কেন্দ্রিক হয়েই বা কেন রয়েছে? প্রশ্ন ওঠে, তাদের নেতাদের পক্ষে সম্প্রদায়কে অর্ধসত্য জানিয়ে রাখাটা কি সঠিক কাজ হচ্ছে? অনেক সময় হয়তো চাকরি ক্ষেত্রে কিছু কিছু রাজ্যে (গুজরাটে ৯ শতাংশ মুসলমান জনসংখ্যা হলেও চাকরি ক্ষেত্রে মোট নিযুক্তির ১১ শতাংশ) বা বিদ্যালয় প্রবেশের সময় কোথাও কোথাও কিছু রকমফের হয়ে থাকতে পারে যা অনভিপ্রেত। কিন্তু দেশভাগের পর থেকে আজ অবধি মুসলমানদের পক্ষে মঙ্গলজনক বা শুভ কোনোকিছুই দেশে হয়নি এটি নির্জলা অসত্য উপস্থাপনা। কেবলমাত্র মুসলমান নেতারা সর্বদা মুসলমানদের কানে তারা বঞ্চিত অবহেলিত এই মন্ত্র দিয়ে তাদের মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখছে। দেশে দীর্ঘদিন লাগু থাকা MGNREGA বা মনরেগা, খাদ্য নিরাপত্তা বা ইন্দিরা আবাস যোজনার মতো প্রকল্পগুলির সুফল কি মুসলমানরা ভোগ করেনি? আর এগুলি সকলের জন্যই, আদৌ সংখ্যালঘুদের জন্য নির্দিষ্ট কোনো প্রকল্প নয়। এবার এই প্রকল্পের সুফল ভোগের মাত্রায় যদি কোনো কম-বেশি হয়ে থাকে (জনসংখ্যার নিরিখে) সেক্ষেত্রে তা কীভাবে সঠিক করা যায় তা নিয়ে বিচার বিবেচনা চলতেই পারে। কিন্তু অনেক কিছুই যেমন করা হয়েছে তেমন অনেক কিছুই করা বাকি থাকতে পারে।

এখন দেখতে হবে মুসলমান নেতারা কেন ব্যর্থ হলেন। কোন কোন ক্ষেত্রে তারা অসফল? কেন আমরা এই সমস্ত নেতাদের যোগ্যতাধারী মুসলমানদের বিপিএল কার্ড, ভোটার আইডি কার্ড, এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ কার্ড, আধার কার্ড ইত্যাদি করানোর দাবিতে কোনো আন্দোলন করতে দেখি না। কেনই বা দেখি না যোগ্য মুসলমানদের ব্যাঙ্ক থেকে লোন পাওয়ার ক্ষেত্রে তাঁদের কোনো তৎপর ভূমিকা। এগুলি হলেই তো তাঁরা তাঁদের নাগরিক হিসেবে অধিকারগুলি নিয়ে সজাগ হতে পারেন। মোদ্দা কথায় মুসলমান নেতারা মুসলমানদের সংবিধান প্রদত্ত অধিকারগুলি যে তাদের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম তা কোনোদিন বোঝান না। কেন বোঝান না দেশভাগ হওয়ার ফলে আদতে দেশের সমস্ত নাগরিকই বিচ্ছিন্ন হওয়ার যন্ত্রণা ভোগ করেছেন। এগুলি যথাযথ ভাবে বোঝালেই আমরা যে একই দেশের নাগরিক ও একই জাতিগত পরিচয়ে আবদ্ধ সেই অনুভূতি দৃঢ় হবে। দেশে থাকতেই পারে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম মতে বিশ্বাস। এখন যতই না বেখাপ্পা শোনাক আমাকে বলতে হচ্ছে মুসলমানদের সামাজিক ও ধর্মীয় নেতারা তাদের নেতৃত্বে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন।

এর ফলে আমরা চটজলদি কতকগুলি ভুঁইফোড় নেতার উত্থান দেখতে পাচ্ছি। এঁরা নিজ নিযুক্ত। এঁরা সাধারণ অবস্থায় দৃশ্যমান হন না। নির্বাচন কাছাকাছি এলেই শীতঘুম ছেড়ে বাজারে আসেন। এঁরা নানান দাবি জানিয়ে, রাজনৈতিক নেতাদের কাছে অভিযোগ পত্র দিয়ে, মুসলমান সম্প্রদায়ের হয়ে দরকষাকষি করে বাজার গরম করতে থাকেন। মজার কথা, তাঁদের এই সব কৌশলী কাজকর্মের কথা অধিকাংশ মুসলমান জানতেই পারে না বা আদৌ গ্রাহ্য করে না। আশ্চর্যের কথা, তাঁরা কোথা থেকে এতটা নিশ্চিন্ত হন যে তাঁদের উপদেশের ভিত্তিতেই মুসলমান সম্প্রদায় এককাট্টা হয়ে ভোট দিয়ে আসবে।

এই মহাজনরা প্রায়শই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কাছ থেকে কিছু কিছু অনুগ্রহের বিনিময়ে নিজ সম্প্রদায়কে সেই দলকে ভোট দেওয়ার আবেদন জানান। আর কোনো দলের কাছ থেকে অনুগ্রহ না পেলেই হুঙ্কার ছাড়তে থাকেন এই দল ধর্মনিরপেক্ষ নয়, এরা সাম্প্রদায়িক। এমনটা মনে হয় যেন এঁরাই সার্টিফিকেট দেওয়ার একমাত্র অধিকারী। এখানেই থেমে না থেকে তাঁরা অপছন্দের দলকে ধর্মনিরপেক্ষতার বিরোধী পর্যন্ত আখ্যা দিয়ে দেন। কিন্তু বোঝেন না বা বুঝতে চান না যে মুসলমান ভোটাররা আর পাঁচজন পরিণত বুদ্ধির নাগরিকদের মতোই সব কিছু অনুধাবন করতে সক্ষম! তাঁরা শেষমেষ সেই দলকেই ভোট দেন যারা তাঁদের দিকে নজর দেন। তাঁদের সুখ-দুঃখের খবর রাখেন।

প্রশ্ন উঠবে, তাহলে এই সব স্ব-নিযুক্ত নেতাদের কোথায় ঠাঁই হবে? সত্যি কথা বলতে কী কোথাও নয়। প্রমাণ খুঁজলে দেখবেন অনেক রাজনীতিবিদই এদের প্রকাশ্যে উপেক্ষা করেছেন, কিন্তু নির্বাচনী ফলাফলে উপেক্ষার পরও আগের চেয়ে বেশি ভোট পেয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে শেষ করব। ভারতে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, মৌলানা হুসেন মাদানি, খান আবদুল গফ্‌ফর খান্ বা তাঁদের ঘরানার নেতার মডেল মজুত রয়েছে যাঁরা স্বাধীনতা আন্দোলনে লড়াই করেছিলেন ও দেশভাগ জীবন দিয়ে রোখার চেষ্টা করেছিলেন। কেননা তাঁরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন ভারত একটি সভ্যতার নাম আর সভ্যতাকে কখনই বিভাজিত করা যায় না। ▌

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বিশেষভবে অনুরোধ জানানো হচ্ছে যে, সরাসরি ব্যাঙ্ক মারফৎ বা মণিঅর্ডার যোগে স্বস্তিকায় টাকা পাঠালে সেই টাকা কী বাবদ পাঠালেন তা সঙ্গে সঙ্গে স্বস্তিকা দপ্তরকে জানান। গ্রাহকদের টাকা পাঠালে তাঁদের সম্পূর্ণ নাম ও ঠিকানা (ফোন নং-সহ) পাঠাতে হবে। অন্যথায় নাম না জানার কারণে আপনাদের পাঠানো টাকার কোনো রসিদ কাটা আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। যার ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নতুন গ্রাহকের টাকা পাঠানো সত্ত্বেও যেমন পত্রিকা পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না, তেমনই বকেয়া টাকার কারণে কারও কারও পত্রিকা সরবরাহ বন্ধ করে দিতে হচ্ছে। এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতির হাত থেকে বাঁচতে আপনাদের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

ইতিমধ্যে আপনি যদি ব্যাঙ্ক মারফৎ স্বস্তিকাতে কোনো টাকা পাঠিয়ে থাকেন তাহলে কবে পাঠিয়েছেন, কত টাকা পাঠিয়েছেন এবং কি বাবদ পাঠিয়েছেন অনুগ্রহ করে সত্বর আমাদের জানান। ব্যাঙ্ক মারফৎ টাকা পাঠালে ব্যাঙ্ক যে রসিদ আপনাকে দেয় সেই রসিদের জেরক্স কপিটা আমাদের পাঠালে ভালো হয়।

— ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

শিয়রে শমন

বাংলাদেশ নয়, ইসলামিক জল্লাদদের মূল লক্ষ্য ভারত

সাধন কুমার পাল

গত ১ জুলাই শুক্রবার ঢাকার গুলশনের হোলি আর্টিজান রেঁস্তোরায় পণবন্দি করে ২০ বিদেশি নাগরিককে কুপিয়ে হত্যার ঘটনাকে ভারতের পুরস্কার ত্যাগী ধর্মনিরপেক্ষ ঘরানা কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন তা এখনো বোঝা যাচ্ছে না। এই ঘটনার আগে পর্যন্ত গত ছ' মাসে ছ'জন হিন্দু পুরোহিতের কুপিয়ে হত্যার ঘটনাকে বিশ্ব জুড়ে ইসলামিক খেলাফত প্রতিষ্ঠার বর্বর প্রয়াস নয়, শেখ হাসিনা খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক লড়াই হিসেবে দেখানোর একটি অপপ্রয়াস লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। ব্যাখ্যাটি এরকম যে বাংলাদেশে হিন্দু পুরোহিতদের কোপালে ভারতে আর এস এস-বিজেপি ক্ষেপে যাবে। আর এস এস-বিজেপি ক্ষেপে যাওয়ার অর্থ কেন্দ্রের সরকার ক্ষেপে গিয়ে হিন্দুদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হওয়ার অজুহাতে শেখ হাসিনার প্রতি আস্থা হারিয়ে খালেদা জিয়াকে ক্ষমতায় বসানোর জন্য কলকাঠি নাড়তে থাকবে। সেজন্য আই এস বা ইসলামিক সন্ত্রাস নয় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই হিন্দু পুরোহিতদের জবাই করে হত্যার মতো 'ছোটখাটো' ঘটনা ঘটানো হচ্ছে। ভারতের দরজায় কড়া নাড়তে থাকা আই এস-এর মতো শিয়রে শমন দেখেও এই স্বঘোষিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী কলমচিদের বিশ্লেষণী ক্ষমতা দেখে হতবাক না হয়ে উপায় নেই। এই ধরনের বিশ্লেষণ দেখে বা শুনে বোঝার উপায় নেই বিগত ৬০ বছর ধরে ধারাবাহিক আক্রমণে হিন্দুশূন্য হতে চলেছে বাংলাদেশ। তালিবানি শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কুপিয়ে হত্যা করা হচ্ছে উদারপন্থী মুসলমানদেরও।

২০১৫-র ২৬ ফেব্রুয়ারি বিজ্ঞানমনস্ক লেখক ও ব্লগার অভিজিৎ রায়কে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। ২০১৫ সালের ৩১ অক্টোবর জাগৃতি প্রকাশনীর তরুণ প্রকাশক দীপনকে মুণ্ডচ্ছেদ করে হত্যা করা হয়। ২০১৬-র ২১ ফেব্রুয়ারি পঞ্চগড় জেলার দেবীগঞ্জে গৌড়ীয় মঠ সংলগ্ন বাড়িতে ঢুকে মঠের প্রধান পুরোহিত ও অধ্যক্ষ যজ্ঞেশ্বর রায়কে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে ও গলা কেটে হত্যা করা হয়। ২০১৬-র ২৪ এপ্রিল রাজশাহি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ড. রেজাউল করিম সিদ্দিকীকে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। ২০১৬-র ৩০ এপ্রিল বাংলাদেশের টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর থানার এক বাজারে নিখিল চন্দ্র নামে ৫৪ বছর বয়সী এক হিন্দু দর্জিকে তাঁর দোকানের সামনেই কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। ২০১৬-র ২০ মে কুষ্টিয়ায় ছানোয়ার রহমান ওরফে ছানা (৫৭) নামে একজন হোমিও চিকিৎসককে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। ২০১৬-র ৮ জুন বাংলাদেশের ঝিনাইদহ সদরের সোনাইখালী গ্রামের মহিষের ভাগাড় নামক স্থানে পুরোহিত আনন্দগোপাল গঙ্গোপাধ্যায় (৭০)-কে জবাই করে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা। ২০১৬-র ১০ জুন বাংলাদেশে পাবনা জেলার হেমায়েতপুর এলাকায় ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র সৎসঙ্গ সেবাশ্রমের সেবক নিত্যরঞ্জন পাণ্ডেকে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। গত ১৫ জুন বাংলাদেশের মাদারীপুর নাজিমুদ্দিন কলেজের গণিতের শিক্ষক রিপন চক্রবর্তীকে ধারালো

সম্প্রতি খুন হওয়া অনুকূল ঠাকুরের আশ্রমের সেবায়ত নিত্যরঞ্জন পাণ্ডে।

> বাংলাদেশকে হিন্দুশূন্য করতে শুধুমাত্র উগ্র ইসলামিক শক্তির পৃষ্ঠপোষক খালেদা জিয়ার দল বিএনপি নয়, হিন্দুর রক্তে হাত রাঙানোর ষড়যন্ত্রে শামিল হওয়ার অভিযোগ উঠছে শেখ হাসিনার আওয়ামি লীগের বিরুদ্ধেও।

বাংলাদেশে হিন্দুহত্যার প্রতিবাদে মিছিল।

অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর আহত করেছে তিনজন হামলাকারী। ১ জুলাই শুক্রবার ঝিনাইদহে রাধামদন গোপাল মঠের সেবাইত শ্যামানন্দ দাস বাবাজীকে (৬২) কুপিয়ে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা। 'বাংলাদেশ একটি ইসলামি রাষ্ট্র, এখানে ধর্মপ্রচার করতে পারবি না। ধর্মপ্রচার করা হলে ২০ থেকে ৩০ তারিখের মধ্যে তোকে চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হবে'। ইসলামিক স্টেট অব্ বাংলাদেশের তরফে ঠিক এই ভাষাতেই বাংলাদেশ রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীকে চিঠি পাঠিয়ে হুমকি দেওয়া হয়েছে।

ব্লগার, লেখক, প্রকাশক, হিন্দু-খৃষ্টান-বৌদ্ধ ধর্মীয় পুরোহিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, মানবাধিকারকর্মী, ভিন্নমতের ইসলামি ভাবধারার অনুসারী, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারীবাহিনীর কর্মকর্তা ও বিদেশিদের ওপর একের পর এক বর্বর হামলার কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করা হলো। ব্যক্তিজীবনের শত্রুতা কিংবা মতাদর্শগত সংঘর্ষ কিংবা হাসিনা-খালেদার রাজনৈতিক লড়াইয়ের অঙ্গ হিসেবে যে এই সমস্ত হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হচ্ছে না এটা বুঝতে বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন নেই। হিন্দুদের হত্যা করা হচ্ছে বাংলাদেশকে হিন্দুশূন্য করে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে। যে সমস্ত আধুনিক উদারপন্থী মুসলমান কট্টর ইসলামিকরণের পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়াবে বলে মনে করা হচ্ছে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে তাদেরও। ১৯৪৭-এর পরে ইসলামিকরণের নামে ৩০ লক্ষেরও বেশি হিন্দুহত্যা হয়েছে। গত ৬০ বছরে বাংলাদেশ নামক ভূখণ্ডে ৫ কোটি হিন্দু গায়েব হয়ে গেছে।

সংখ্যাতত্ত্ব থেকে দুটো বিষয় স্পষ্ট। এক, ভারত ও নেপালের পর এখনো বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক হিন্দু বসবাস করে।*(সারণি দ্রষ্টব্য)*। দুই, যে হারে হিন্দু জনসংখ্যা কমে আসছে তাতে অচিরেই বাংলাদেশ পাকিস্তানের মতো হিন্দুশূন্য হয়ে যাবে। এই সংখ্যাতত্ত্বের সঙ্গে বাংলাদেশে ব্লগার, লেখক, প্রকাশক, হিন্দু-খৃষ্টান-বৌদ্ধ ধর্মীয় পুরোহিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, মানবাধিকারকর্মী, ভিন্নমতের ইসলামি ভাবধারার অনুসারী, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তা ও বিদেশিদের ওপর একের পর এক বর্বর হামলার ঘটনা যুক্ত করলে এটা বলতেই হবে দক্ষিণ এশিয়ায় অচিরেই বাংলাদেশ নামক পাকিস্তানের মতো আরেকটি ইসলামিক সন্ত্রাসের আতুড়ঘর আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে, যা কি না ভারত তো বটেই সমগ্র বিশ্বের মাথা ব্যথার কারণ।

পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাংলাদেশের জন্ম হলেও বাংলাদেশিদের একটি ভালো অংশের মন থেকে পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হয়নি। এই উগ্র ইসলামিক গোষ্ঠীর চাপেই ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশের সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটি বাদ দিয়ে ১৯৮৮ সালে ইসলামিক রাষ্ট্র ঘোষিত হয়। এই পাকিস্তান-মনস্করাই জুম, জেএসবি, জামাতে ইসলামির মতো উগ্র ইসলামিক সন্ত্রাসবাদী দল গড়ে তালিবান, আলকায়দা, আই এস-এর মতো বিদেশি সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের মদতে বাংলাদেশকে উগ্র ইসলামিক দেশে পরিণত করে চিরশত্রু ভারত দখল অভিযান শুরু করতে চায়।

বাংলাদেশকে হিন্দুশূন্য করতে শুধুমাত্র উগ্র ইসলামিক শক্তির পৃষ্ঠপোষক খালেদা জিয়ার দল বিএনপি নয়, হিন্দুর রক্তে হাত রাঙানোর ষড়যন্ত্রে শামিল হওয়ার অভিযোগ উঠছে শেখ হাসিনার আওয়ামি লীগের বিরুদ্ধেও। আওয়ামি লীগ বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন দল। কৌশলগত কারণেই উগ্র ইসলামিক শক্তি ক্ষমতাসীন দলের ছত্রছায়ায় থেকে নিজেদের উদ্দেশ্য পূরণে উদ্যোগী হবে এটাই স্বাভাবিক। ফলে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও উদারপন্থী মুসলমানরাও আওয়ামি লীগের রাজনৈতিক আশ্রয়ে আর নিরাপদ বোধ করতে পারছেন না। বাংলাদেশে সন্ত্রাস বিরোধী কঠোর প্রশাসনিক পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে আওয়ামি লীগের মতো উদারপন্থী বলে চিহ্নিত রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে উগ্র ইসলামি বেনো জলের অনুপ্রবেশ রোধ ও নিষ্কাশন অত্যন্ত জরুরি। সঙ্গে সঙ্গে জেহাদি নির্মাণের আতুড়ঘর খারিজি মাদ্রাসাগুলিও বন্ধ করে ওই দেশের উদারপন্থী মুসলমানদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রভাবশালী সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলাও প্রয়োজন।

সিপিএম নেতা মহম্মদ সেলিমকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, প্যালেস্টাইন বা কিউবার ঘটনার মতো বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হত্যার প্রতিবাদে আপনারা রাস্তায় নামছেন না কেন? সেলিমের সহজ উত্তর, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা প্রতিবাদ করছেন সেটাই যথেষ্ট। একই প্রশ্নের উত্তরে কংগ্রেস নেতা রসিদ আলভি বলেন এটা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ

ব্যাপার। ভারতের স্বাধীনতা ও দেশভাগের মতো ঐতিহাসিক কারণেই আজ পাকিস্তান বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন। হিন্দুরা নির্যাতিত হলে ঐতিহাসিক ও মানবিক কারণে ভারতে আশ্রয় নেবে এটাই স্বাভাবিক। চরম বিপদের সময় এক সময় অখণ্ড ভারতের বাসিন্দা এই হিন্দুদের পাশে না দাঁড়ানো শুধু অমানবিকতাই নয় চরম বিশ্বাসঘাতকতাও বটে।

দেশভাগের পর থেকে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের হিন্দুরা যদি প্রতিবাদী ভারতকে পাশে পেতো তাহলে হয়তো ওই দেশগুলিতে সংখ্যালঘুদের এতটা দুর্দশার মধ্যে পড়তে হতো না। ওই দেশগুলির জন্মলগ্ন থেকেই সংখ্যালঘু হিন্দুরা অত্যাচারিত হয়ে ধারাবাহিক ভাবে ভারতে আশ্রয় নিচ্ছে। এতে ভারতেও সামাজিক, রাজনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে সংখ্যালঘুদের উপর যে কোনো ধরনের আক্রমণের ঘটনাকে ওই দেশগুলির অভ্যন্তরীণ বিষয় বলে এড়িয়ে না গিয়ে ভারতের সরকার ও জনগণের সোচ্চার হওয়ার পূর্ণ অধিকার আছে।

এরকম প্রতিবাদ হলে আন্তর্জাতিক মহলে সৃষ্টি হওয়া সহানুভূতি ও নজরদারি পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুদের অন্যতম রক্ষাকবচ হয়ে উঠতে পারতো। প্যালেস্টাইন বা কিউবার ঘটনা নিয়ে আওয়াজ উঠলেও, ভারতে এই প্রতিবেশী দেশগুলিতে সংখ্যালঘু নিপীড়নের বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ কখনোই হয়নি। ভারতীয় জনতা পার্টি ও বিভিন্ন হিন্দু সংগঠন যারাই এই হিন্দু নিপীড়ন নিয়ে সোচ্চার হয়েছে তাদেরকেই সাম্প্রদায়িক বলে চিহ্নিত করার প্রয়াস হয়েছে। স্পষ্টতই এর পেছনে রয়েছে ভোটব্যাঙ্কের নোংরা রাজনীতি ও দ্বিচারিতা। প্যালেস্টাইন বা কিউবা নিয়ে প্রতিবাদে শামিল হলেও পাকিস্তান বাংলাদেশ নিয়ে প্রতিবাদের প্রশ্ন উঠলে বলা হচ্ছে এতে নাকি প্রতিবেশী দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা হয়।

পাকিস্তান হিন্দুশূন্য। বাংলাদেশও সেই পথে। তবে বাংলাদেশ এখনো হিন্দু জনগোষ্ঠীর তৃতীয় বৃহত্তম বাসস্থান। হিন্দুরা নতুন করে ভিটেচ্যুত হলে আশ্রয় নেবে ভারতে। সৃষ্টি হবে শরণার্থী সমস্যা। বাংলাদেশ চলে যাবে ইসলামি জল্লাদদের কব্জায়। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য বলছে বাংলাদেশ উপলক্ষ্য মাত্র, জেহাদিদের আসল লক্ষ্য ভারত। ভারতের সুরক্ষার জন্যই বাংলাদেশকে ইসলামিক জল্লাদদের কব্জায় যাওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে হবে। সেজন্য এখনই তেড়ে ফুঁড়ে রাস্তায় নামা প্রয়োজন।

সারণি

১৯৪৭ সালে পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দুসংখ্যা	১৯৮১ সালে বাংলাদেশে হিন্দুসংখ্যা	২০১১ সালে বাংলাদেশে হিন্দুসংখ্যা
২৮%	১২%	৮.৫%

১৯৪৭ সালে পাকিস্তানে হিন্দুসংখ্যা	১৯৯৮ সালে পাকিস্তানে হিন্দুসংখ্যা
১৫%	১.৬%

ভারতে হিন্দুসংখ্যা	নেপালে হিন্দুসংখ্যা	বাংলাদেশে হিন্দুসংখ্যা
৯৬.৬৩ কোটি	২.৩৪ কোটি	১.৩৫ কোটি

সংখ্যাতত্ত্ব বলছে এখনো বিশ্বে ভারত ও নেপালের পর সবচেয়ে বেশি হিন্দু বাংলাদেশেই বসবাস করে।

বিশ্বজুড়ে সন্ত্রাসবাদের থাবা

- ইরাক, জানুয়ারি ৩, ২০১৬— ইরাকি মিলিটারি বেসে ৫ সন্ত্রাসবাদীর আত্মঘাতী হামলা। নিহত ১৫, আহত ২২।
- লিবিয়া, জানুয়ারি ৭, ২০১৬— সমুদ্রশহর ব্লটেনের পুলিশ প্রশিক্ষণ শিবিরে ট্রাকবোমা বিস্ফোরণ। নিহত ৫০, আহত ১০০।
- ইরাক, জানুয়ারি ১১, ২০১৬— শপিংমলে আত্মঘাতী হামলা। নিহত ২০, আহত ৪০।
- সোমালিয়া, জানুয়ারি ১৫, ২০১৬—কেনিয়ান আর্মি বেসে আল-শাবাব সন্ত্রাসবাদীদের হামলা। নিহত ৬৩, আহত অসংখ্য।
- নাইজিরিয়া, জানুয়ারি ৩০, ২০১৬—নাইজিরিয়ার গ্রামে বোকো হারাম উগ্রপন্থীদের হামলা। নিহত ৬৫, আহত ১৩৬।
- আইভরি কোস্ট, মার্চ ১৩, ২০১৬—গ্র্যান্ড ব্যাসামের ৩টি হোটেলে আলকায়দা বন্দুকবাজদের অতর্কিত আক্রমণে নিহত ১৮।
- বেলজিয়াম, মার্চ ২২, ২০১৬— ব্রাসেলসের মেট্রো রেলে আত্মঘাতী হামলা। নিহত ৩৫, আহত ৩০০।
- পাকিস্তান, মার্চ ২৭, ২০১৬— ইস্টার উপলক্ষে সমবেত খৃষ্টানদের ওপর তালিবান হামলা। নিহত ৭০, আহত ৩০০।
- বাংলাদেশ, জুলাই ১, ২০১৬— ঢাকার ইটালিয়ান রেঁস্তোরায় আই এস এবং জামাত-উল-মুজাহিদিন-এর যৌথ হামলা। নিহত ২০।
- ইরাক, জুলাই ৩, ২০১৬— বাগদাদে পরপর ২ বার বোমা বিস্ফোরণ। নিহত ১৭৪, আহত ২২১।

অপারেশন সদ্ভাবনা

কাশ্মীরে ভারতীয় সেনার জনকল্যাণমুখী প্রকল্প

বিশেষ প্রতিনিধি।। জম্মু-কাশ্মীরে ভারতীয় সেনার জনকল্যাণমুখী প্রকল্প অপারেশন সদভাবনার কাজ মসৃণ গতিতে এগিয়ে চলেছে। রাজ্যের বেশির ভাগ মানুষ সেনার এই মানবিক ভূমিকায় উচ্ছ্বসিত। আবার পাশাপাশি এমন অনেক দেশবিরোধী সমাজবিরোধী বিচ্ছিন্নতাবাদী মানুষও আছে যারা রীতিমতো হতাশ।

বস্তুত শেষোক্ত দলের লোকেরা কোনোভাবেই রাজ্যের উন্নতি চায় না। উন্নয়নের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কাশ্মীরের মানুষ যত নিঃস্ব হবেন, ক্ষোভে-দুঃখে মনে মনে গুমরে উঠবেন তত এদের লাভ। সীমান্তপারের প্রভুদের নির্দেশ মেনে এদের প্রথম এবং প্রধান কাজ ভারতীয় সেনা ও সাধারণ মানুষের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করা। সুতরাং অপারেশন সদভাবনার সাফল্য যে এদের বাড়াভাতে ছাই ফেলবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

১৯৯০-এর গোড়ার দিক— জম্মু-কাশ্মীরের সর্বত্র তখন ভাঙন আর ধ্বংসের আবহাওয়া— সেটা ছিল ইসলামি সন্ত্রাসবাদের অঙ্কুরোদ্গমের সময়। ধীরে ধীরে তা রাজ্যের মুসলমানদের একটা বেশ বড়ো অংশের হৃদয়ে জায়গা করে নেয়। ভেঙে পড়ে রাজ্যের শাসনব্যবস্থা। এরকম একটা সময় যখন আসে তখন অর্থনীতি ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কাশ্মীরেও তাই হয়েছিল। লাগাতার সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে দিশেহারা কাশ্মীরের অর্থনীতি সহ সমগ্র প্রশাসনিক পরিকাঠামোটাই বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। সেই সময় থেকে ভারতীয় সেনা অপারেশন সদভাবনার মাধ্যমে ভারতের সব থেকে পিছিয়ে পড়া রাজ্যটির যন্ত্রণার ভার লাঘব করার চেষ্টা করছে। উদ্দেশ্য কাশ্মীরের সাধারণ মানুষের দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেওয়া। সেনাবাহিনী সম্বন্ধে মানুষের নেতিবাচক মনোভাব দূর করে একটা সদর্থক ভাবমূর্তি গড়ে তোলা।

জম্মু-কাশ্মীর এমন একটা রাজ্য যেখানে সরকারি স্কুলগুলোয় চারজন করে শিক্ষক পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ! সন্ত্রাসবাদের সেই বাড়বাড়ন্তের সময়ে, সরকারি স্কুলের শিক্ষকেরা বাড়ির কাছাকাছি স্কুলে পোস্টিং চাইতেন। যাতে যাতায়াত বা যোগাযোগের ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধে না হয়। ফলে যেসব জায়গায় যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো নয় কিংবা কাছাকাছি কোনো শিক্ষকের বাড়ি নেই, সেখানকার স্কুলগুলোতে পড়ানোর লোক পাওয়া যেত না। অনেক জায়গায় আবার সন্ত্রাসবাদীরা স্কুলে আগুন লাগিয়ে দিত। সদভাবনার আওতায় ভারতীয় সেনা কাশ্মীরের দুর্গমতম অঞ্চলে আর্মি গুডউইল স্কুল তৈরি করে। প্রত্যন্ত অঞ্চলের ছেলেমেয়েদের কাছে পড়শোনা করার সুযোগ পৌঁছে যায়। সেই সঙ্গে বেড়ে যায় প্রশিক্ষিত শিক্ষকদের চাকরি পাবার সুযোগ। সেই ১৯৯১ থেকে সেনাবাহিনী পরিচালিত স্কুলগুলি রাজ্যের নিম্ন এবং উচ্চ মধ্যশিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। লক্ষাধিক ছাত্রছাত্রী ইতিমধ্যেই উপকৃত। আরও অনেকগুলি স্কুল তৈরির প্রস্তাব রয়েছে। যা কার্যকর করা হলে বহু ছাত্রছাত্রী উপকৃত হবে।

অপারেশন সদভাবনার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হলো স্বাস্থ্য। ভূস্বর্গের শীতকাল এমনিতেই বিখ্যাত। গোটা শীতকালের চল্লিশটা দিন বড়ো মারাত্মক। এ সময় সারাদিন বরফ পড়ে, তুষারঝড়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে জনজীবন। সাধারণ অসুখ-বিসুখ ছাড়াও এসময় এমন অনেক অসুখ দেখা দেয় যার চিকিৎসা জরুরি ভিত্তিতে করা প্রয়োজন। ভারতীয় সেনা দীর্ঘকাল ধরে এই দায়িত্ব দক্ষতার সঙ্গে পালন করে আসছে। গত তিন বছরেই সেনা পরিচালিত সদভাবনা স্বাস্থ্যশিবিরে ৩.৬৮ লক্ষ মানুষ চিকিৎসা-সাহায্য পেয়েছেন। পশুস্বাস্থ্যশিবিরে ৪.৫৭ লক্ষ গবাদি পশুর চিকিৎসা করা হয়েছে।

সদভাবনার আওতায় জাতীয় সংহতি বাড়ানোর উদ্দেশ্যে প্রায় ২০০টি ভ্রমণের আয়োজন করেছে ভারতীয় সেনা। এখনও পর্যন্ত প্রায় ৫০০০ মানুষ অন্যান্য রাজ্যে গিয়ে দেখে এসেছেন সেখানকার উন্নয়ন। পরিচয় হয়েছে তাদের বৃহত্তর ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে। দেশের সুনাগরিক হবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে তারা ঘরে ফিরেছেন।

কাশ্মীরী যুবক-যুবতীদের দক্ষতা বাড়ানোর ওপর জোর দিচ্ছে ভারতীয় সেনা। খোলা হয়েছে বেশ কয়েকটি কারিগরী শিক্ষাকেন্দ্র। উদ্দেশ্য কর্মসংস্থান আরও বাড়ানো। এছাড়া রয়েছে রাস্তা, সেতু এবং কমিউনিটি হল নির্মাণ। কাশ্মীরের মানুষের জীবনযাত্রার মান যাতে আরও উন্নত করা যায় তার জন্য নানাভাবে প্রয়াস করা হচ্ছে। যে কোনো জনকল্যাণমুখী প্রকল্পের সাফল্য নির্ভর করে তার জনপ্রিয়তা জনগণের অংশগ্রহণ এবং উপকৃত জনসংখ্যার ওপর। সদভাবনার ক্ষেত্রে প্রতিটি শর্তই সন্তোষজনকভাবে পালিত। স্থানীয় মানুষদের বিরাট অংশের কাছে ভারতীয় সেনার ভূমিকা উপকারী বন্ধুর। রাস্তা বা সেতু নির্মাণ থেকে ব্যাঙ্কঋণের দরখাস্ত লিখে দেওয়া— সেনার সাহায্যের পরিধিটা এত বড়ো যে নির্ভর না করে উপায় নেই। কাশ্মীরের মানুষ যারা অযথা হিংসা হানাহানি রক্তক্ষয় থেকে মুক্তি চান তারা জানেন ভারতীয় সেনা শুধু তাদের রক্ষক নয়, পালকও। ■

অন্ধত্বকে জয় করে ৫০ কোটির মালিক

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ প্রত্যন্ত গ্রামের নিরক্ষর এবং অতিশয় গরিব পরিবারের সন্তান, আবার এম আই টি পাশ ও ৫০ কোটি টাকার কোম্পানির ধোপদুরস্ত চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার— দুটো ছবি একে অপরের সঙ্গে মেলে না। কিন্তু শ্রীকান্ত বোল্লা মিলিয়েছেন।

এ আর এমনকী? অনেকেই আছেন যারা হতদরিদ্র অবস্থা থেকে সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছেছেন। কিন্তু শ্রীকান্ত আর অন্যান্যদের মধ্যে তফাত আকাশ-পাতাল। ২৪ বছর আগে চির-অন্ধকার চোখ নিয়ে জন্মান শ্রীকান্ত। জন্মের পরপরই এই অকেজো সন্তানকে গলা টিপে মেরে ফেলার 'সুপরামর্শ' দেওয়ার লোকের অভাব হয়নি। অন্ধ ছেলেকে চাষের মাঠে দরকার নেই ভেবে বাবা তাকে স্কুলে ভর্তি করে দেন। কিন্তু স্কুলে এই শারীরিকভাবে অক্ষম ছেলেটির প্রতি সমবেদনা ও সাহায্যের হাত বাড়ানো দূরে থাক উল্টে জোটে আরও লাঞ্ছনা। ক্লাসে ঠাঁই হয় সব শেষের বেঞ্চে। শারীরিক প্রশিক্ষণের ক্লাসে জোটে সমবেত পরিহাস।

পড়াশুনায় কোনো অগ্রগতি না দেখে ছেলেকে হায়দরাবাদের 'দিব্যাঙ্গ'দের জন্য একটি বিশেষ স্কুলে ভর্তি করে দেন শ্রীকান্তের বাবা। তারই মতো অন্য বন্ধুদের পেয়ে ও বিশেষ সাহচর্যে ৯০ শতাংশ নম্বর পেয়ে দশম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয় সে। কিন্তু এরপরই আবার প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয় তাকে। ৯০ শতাংশ নম্বর পাওয়ার পরও স্কুল এবং পরে অন্ধ্রপ্রদেশ এডুকেশন বোর্ড তার বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হওয়ার আবেদন না-মঞ্জুর করে দেয়। কারণ সে জন্মান্ধ। এবার শ্রীকান্তর লড়াই সরকারের সঙ্গে। সরকারি এই বোর্ডের বিরুদ্ধে কোর্টে কেস করে সে। ছ'মাস অপেক্ষার পর জিত হয় তার। তবুও এক শর্তে, 'নিজস্ব ঝুঁকিতে' সে বিজ্ঞান বিষয়ে পড়তে পারে। সমস্ত পড়ার বইগুলোর অডিও সংস্করণ জোগাড় করে, দিনরাত এক করে অধ্যয়ন চালাতে থাকে। ৯৮ শতাংশ নম্বর পেয়ে দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষায় পাশ করার পর আই আই টি-তে পড়ার জন্য আবেদন জানায়। কিন্তু এবারও সেই একই ঘটনা। 'You are blind, hence you are not allowed to apply for competitive exam.'। আই আই টি-র এই বিমাতৃসুলভ আচরণের কাছে মাথা না নুইয়ে আরো বৃহত্তর ক্ষেত্রের সন্ধান চালায়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের চারটি শীর্ষস্থানীয় প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ম্যাসাচুস্টেস্ ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, স্ট্যানফোর্ড, বার্কলে এবং কার্নেগি মেলনে আবেদন জানায়। এর প্রতিটিতেই সে সুযোগ পেলেও বেছে নেয় এম আই টি। এবারও সে রেকর্ড করে এম আই টি-র প্রথম আন্তর্জাতিক দৃষ্টিহীন ছাত্র হিসাবে। স্কলারশিপ নিয়ে বিদেশে পাঠ সম্পূর্ণ করে প্রতি মাসে পাঁচ অঙ্ক ডলারের চাকরি ছেড়ে সে দেশে ফিরে আসে তারই মত দিব্যাঙ্গদের জীবনে আশার আলো জ্বালাতে। সমাজ যাদের শারীরিক প্রতিবন্ধকতা হেতু অন্যদের মতোই সমানভাবে মেনে নেয়নি, সমান সুযোগ-সুবিধা দেয়নি, সম্মান দেয়নি তাদের জন্য সমানভাই নামে হায়দরাবাদে একটি এনজিও খোলে সে। নিজেকে নতুনভাবে আবিষ্কার করে। আগে যেখানে পিটি ক্লাসে অংশ নিতে পারতো না, সহপাঠীদের সঙ্গে খেলতে পারতো না, নতুন স্কুলে এসে সে দাবা ক্রিকেট খেলা শিখেছে। দৃষ্টিশক্তি না থাকা সত্ত্বেও পড়াশুনার মতো খেলাধুলাতেও সে অন্যদের থেকে এগিয়ে ছিল।

মাত্র ২৪ বছর বয়সেই সে ব্রেইলশিক্ষা, ডিজিটাল লাইব্রেরি, ব্রেইল প্রিন্টিংপ্রেস এবং দৃষ্টিহীন শিক্ষার্থীদের জন্য টিউটোরিয়ালও চালু করে। তার এনজিওর মাধ্যমে তিনি এখনও পর্যন্ত ৩,০০০ শিক্ষার্থীর জীবনে শিক্ষার আলো জ্বেলেছেন। তাদের সম্মানের সঙ্গে বাঁচতে শিখিয়েছেন। ২০১২ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন বোলান্ট ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড। পরিবেশ-বান্ধব উপকরণ বানানোর লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ দেওয়া দেওয়া হয় শতাধিক দৃষ্টিহীন ছেলেমেয়েকে। সুপারি পাতার প্লেট, কাপ, ট্রে, ডিনারাওয়ার, পান পাতার থালা, ডিসপোজেবল্ প্লেট, চামচ, কাপ বানানোর পাশাপাশি কালি এবং প্রিন্টিং দ্রব্যও উৎপাদন করে। তার এই কোম্পানিতে ১৫০ জন দৃষ্টিহীন কাজ করেন এবং ৫টি জায়গায় কারখানার ইউনিট খোলা হয়েছে— হুবলি (কর্ণাটক), নিজামবাদ (তেলেঙ্গানা) ও হায়দরাবাদ (তেলেঙ্গানা)-এ দুটি। পরবর্তী প্ল্যান্টটি সম্পূর্ণ বিদ্যুৎচালিত হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। তাঁর এই সাফল্যে ভাগ্য-লক্ষ্মীও তাঁর প্রতি সদয় হয়েছেন। বর্তমান তিনি ৫০ কোটি টাকার মালিক।

এই গরিব সন্তান লিভ ইন্ডিয়া প্রোজেক্টে এপিজে আব্দুল কালামের সঙ্গেও কাজ করেছেন। তিনি শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে অস্বীকার না করে বলেন, 'I was made blind by the perception of the people'। সমগ্র পৃথিবী যখনই তার প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন, তখনই বাধা টপকে দাঁড়িয়ে তিনি বলেছেন, 'I can do anything.' অন্ধত্ব তার জীবনে কখনই বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি, বরং তাকে আর পাঁচজনের থেকে আলাদা করেছে, বিশিষ্ট মানুষ হিসাবে তৈরি করেছে, প্রতিকূলতা জয় করতে শিক্ষা দিয়েছে। ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধ তিতে মাত্র ২০০০টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

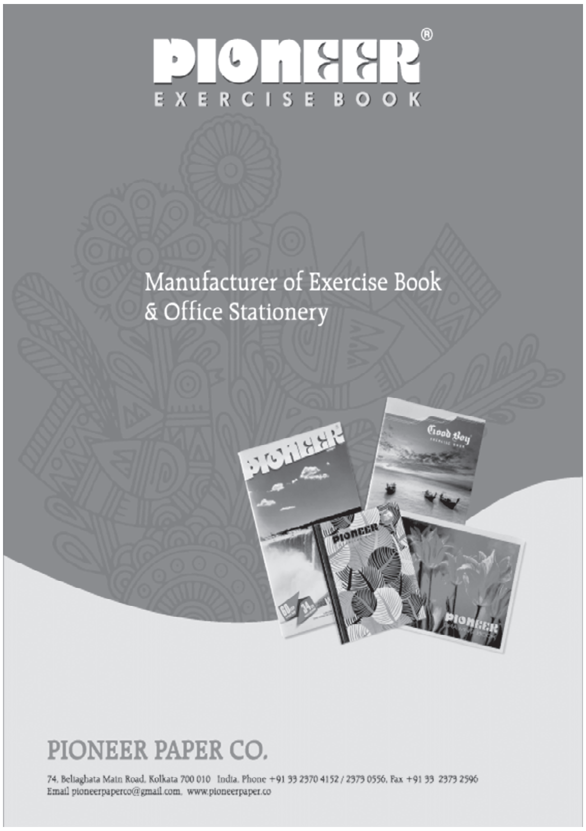

‘পুরাণের কাহিনীতে আছে, বহু যুগ পূর্বে ভারতের সিংহাসনে রামচন্দ্র নামে এক রাজা সমাসীন হন, যিনি সাক্ষাৎ ভগবান। কথিত আছে, মানবের সম্মুখে রাজার আদর্শ কিরূপ হওয়া উচিত, তা দেখাবার জন্য স্বয়ং শ্রীবিষ্ণু, রামচন্দ্ররূপে দেহধারণ করেন এবং অনন্তকাল যিনি শ্রীবিষ্ণুর বক্ষোবিলাসিনী সেই লক্ষ্মী দেবী স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্রের পত্নী সীতাদেবীর রূপ পরিগ্রহ করেন।’

— *ভগিনী নিবেদিতা*

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

চিকিৎসাশাস্ত্রে পেঁয়াজ

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

বৈজ্ঞানিক মতে পেঁয়াজ উষ্ণ, হালকা, তিক্ত, উত্তেজক, সারক (মল ও বায়ু নিঃসরণ করায়), মূত্র বৃদ্ধি করে, কফ নাশ করে, মনের উদ্বেগ অর্থাৎ ঘাবড়ানো ভাব কমায়। জ্বর, ড্রপসি বা জলোদর, সর্দি জীর্ণ কফ ও কাশি, পেটের ব্যথা বা উদর শূল, হাঁপানি বা শ্বাসকষ্ট লাঘব করে। রক্তপিত্ত অর্থাৎ পিত্তের বিকারের ফলে দূষিত রক্তের প্রকোপ সারিয়ে তোলে।

শরীর সুস্থ রাখতে পেঁয়াজ

(ক) গরমকালে কাঁচা পেঁয়াজ ও কাঁচা আম কুচিয়ে কেটে স্যালাড তৈরি করে খেলে সূর্যের তাপে বা তীব্র রোদ্দুরেও শরীর খারাপ হবে না।

(খ) পেঁয়াজ খেলে 'লু' অর্থাৎ গরম হাওয়া লাগে না একথা তো সকলেরই জানা।

(গ) পেঁয়াজ ব্রেন (মস্তিষ্ক) ও হার্টের পক্ষে উপকারী।

(ঘ) বৃদ্ধদের ও বয়স্কদের পেঁয়াজ নিয়মিত খাওয়া উচিত।

(ঙ) শরীরে দুর্বলতার জন্যে যদি মাথা ঘোরে তাহলে পেঁয়াজ খেলে উপকার পাওয়া যাবে। পেঁয়াজ বায়ু সারায়।

(চ) আয়ুর্বেদে পেঁয়াজকে অত্যুত্তম রসায়ন ও পরম ঔষধি বলা হয়। রসায়ন অর্থে শরীরের সপ্ত ধাতুকে পুষ্ট করে। এই সপ্ত ধাতু হলো রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও বীর্য। এই মত অনুসারে পেঁয়াজ হলো পুষ্টিকর আহার। পেঁয়াজ খেলে খিদে বাড়ে।

(ছ) প্রচলিত ধারণা অনুসারে পেঁয়াজ শরীরের পক্ষে খুব গরম বলে মনে করা হয়। এটা কিন্তু ঠিক নয়। পেঁয়াজ রান্না করে খেলে বা রস খেলে তা মধুর, তবে কফ বৃদ্ধি করে, পিত্ত বেশি বৃদ্ধি করে না, বীর্যবর্ধক এবং বায়ুজনিত শূল বা তীব্র ব্যথা দূর করে।

(জ) সাদা পেঁয়াজ শরীরে বল বৃদ্ধি করে, কামোত্তেজনা বা ধাতু বাড়িয়ে দেয়। এটি স্নিগ্ধ, দীপন অর্থাৎ উত্তেজনা ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। টিবি (ক্ষয় রোগ), হার্টের অসুখ, বমি, অরুচি, বাত, পিত্ত, অর্শ, রক্তের দোষ, এমনকী কলেরাও সারিয়ে তোলে।

(ঝ) বেশি ঘাম হলে বা শরীরের কোনো অংশ ফুলে গেলেও পেঁয়াজ খেলে উপকার পাওয়া যায়। অর্থাৎ অতিরিক্ত ঘাম হওয়া বন্ধ করে এবং ফোলাও কমে।

(ঞ) লাল পেঁয়াজ শীতল, খিদে বাড়ায়, কামোত্তেজনা ও শরীরের বল বৃদ্ধি করে। বায়ু, কফ, শরীর ফুলে যাওয়া, অর্শ ও কৃমি সারিয়ে দেয়।

(ট) চরক ও সুশ্রুত দুই প্রধান প্রাচীন ভারতীয় বিখ্যাত বৈদ্যর মতে পেঁয়াজ শক্তিদাতা, শরীর পুষ্ট করে, মেধা ও বুদ্ধি বর্ধিত করে।

(ঠ) বৈদ্য বাগভট্টের মতে পেঁয়াজের মধ্যে বাত ও কফের জন্যে যেসব অসুখ করে সেগুলি সারাবার এবং অর্শ সারাবার গুণ আছে। তাঁর মতে পেঁয়াজ বেটে নিয়ে গরম সেঁক দিলেও উপকার পাওয়া যায় অর্শ রোগে।

(ড) পেঁয়াজ ত্রিদোষ অর্থাৎ বাত, পিত্ত ও কফ নাশক। পেঁয়াজ খেলে বাতের প্রকোপ কমে, পিত্তের দোষ বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে শরীর শান্ত হয়, কফ দূর হয়। অবশ্য একটু কাফেরও সৃষ্টি করে। সে জন্যে কোনো কোনো বৈদ্য কফ রোগে পেঁয়াজ খেতে বারণ করেন। কিন্তু সত্য কথা বলতে কী বৃদ্ধদের এবং যেসব মহিলাদের বাচ্চা ছোট তাঁদের পক্ষে কফের প্রকোপ হলে পেঁয়াজ খাওয়া ভাল।

পেঁয়াজের রস ব্যবহারে অনেক রোগের হাত থেকেই নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে

(১) মাথার চুল পড়ে গেলে, চুলের বৃদ্ধি কমে গেলে বা অল্প বয়সে চুল পেকে গেলে পেঁয়াজের রসে মধু মিশিয়ে মাথায় মালিশ করুন।

(২) **মাথা ধরলে :** পেঁয়াজ থেঁতো করে কপালে লাগাবেন বা থেঁতো করা পেঁয়াজ খাবেন।

(৩) **কানে ব্যথা হলে :** পেঁয়াজের রস গরম করে কানে দু—তিন ফোঁটা ফেলুন।

(৪) **জ্বর ও হাঁপানিতে :** পেঁয়াজের রস খেলে উপকার পাওয়া যাবে। কালাজ্বরের ক্ষেত্রে পেঁয়াজের রস খুবই কাজ দিত।

(৫) **স্নায়ুর রোগে অর্থাৎ স্নায়ু দৌর্বল্যে বা স্নায়ু বিকারে :** পেঁয়াজ খেলে বা পেঁয়াজ শুঁকলে উপকার পাওয়া যায়।

(৬) **হেঁচকিতে :** পেঁয়াজের রসের ফোঁটা নাকে দিলে উপকার পাওয়া যায়।

(৭) **মেয়েদের মূর্ছা বা হিস্টিরিয়ায় :** পেঁয়াজের রস শুঁকিয়ে দিলে সুফল পাওয়া যায়।

(৮) **ঘুম না হলে :** রাত্তিরে নিয়মিত পেঁয়াজ খেতে হবে।

(৯) **কিডনির অসুখ ও উদরীতে (পেটে জল জমে যাওয়া) :** পেঁয়াজ খেলে রোগের প্রকোপ কমে।

(১০) **অর্শ রোগে :** পেঁয়াজ কুচিয়ে টক দই মিশিয়ে খেলে উপকার পাওয়া যায়।

(১১) **বিছে, বোলতা ও মৌমাছির কামড়ে :** পেঁয়াজ ছেঁচে প্রলেপ লাগালে জ্বালা কমে।

প্রতিদিন যদি পেঁয়াজ অল্প তেলে সাঁতলে নিয়ে আন্দাজমতো নুন, কাঁচা লঙ্কা ও কুচনো ধনেপাতা দিয়ে ভাত বা রুটির সঙ্গে খাওয়া যায় তাহলে আহার ও ওষুধ দুই-ই হবে। অর্থাৎ খেতে ভাল লাগবে, শরীরও ভাল থাকবে। ■

ফঃ ৫

সমাবেশ সমাচার

হাওড়ার তাজপুরে রক্তদান শিবির

শ্যামাপ্রসাদ ইন্সটিটিউট অব্ কালচার তাজপুর, হাওড়ার উদ্যোগে গত ৬ জুলাই সকালে বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১১৬তম শুভ জন্মজয়ন্তী পালিত হয়েছে। শুরুতেই ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, স্বামী বিবেকানন্দ ও পল্লীপ্রাণ সমাজসেবী প্রসাদ চক্রবর্তীর মর্মর মূর্তিতে মাল্যার্পণ করা হয়। বর্ষব্যাপী বৃক্ষরোপণের সূচনাস্বরূপ কয়েকটি চারাগাছ রোপণ করা হয়। পরে প্রসাদতীর্থ সভাগৃহের জনাকীর্ণ সমাবেশে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে মনোগ্রাহী আলোচনা করেন বিজেপির রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক প্রতাপ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতার ৮৭নং

ওয়ার্ডের পুরপিতা সুব্রত ঘোষ, স্থানীয় বিধায়ক অসিত মিত্র, বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী পৃথ্বীশকুমার সামন্ত ও নন্দলাল মণ্ডল। ১৯৮৫ সাল থেকে সংস্থা দীর্ঘ ৩২ বৎসর এই দিনটিকে স্বেচ্ছা রক্তদানের জন্য চিহ্নিত করে ধারাবাহিক ভাবে রক্তদান শিবির আয়োজন করে আসছে। আজকের ৩২ বর্ষের ৩৪ তম রক্তদান শিবিরে ৯ জন মহিলাসহ মোট ৬৭ জন রক্তদান করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংস্থার চেয়ারম্যান শিশির ভট্টাচার্য ও পরিচালনা করেন তপন রীত।

ত্রিপুরেশ্বরী শিশুমন্দিরে শিশুবিজ্ঞান মেলা

আগরতলায় বিদ্যাভারতী শিক্ষা সমিতি রামনগর ২নং রোডস্থিত ত্রিপুরেশ্বরী শিশুমন্দিরের ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা গত ১৩ মার্চ বিদ্যালয়ে এক শিশুবিজ্ঞান মেলা অনুষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয়ে পাঠরত চার থেকে আট বছর বয়সের শিশুরা মেলায় পনেরোটি বৈজ্ঞানিক মডেলের মাধ্যমে মানবকল্যাণে বিজ্ঞানের বিভিন্ন অবদানের বিষয় অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরে। এই উপলক্ষে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। শঙ্খধ্বনি ও নারকেল ফাটিয়ে এই মেলার শুভ উদ্বোধন করেন বিদ্যাভারতী শিক্ষা সমিতির সভাপতি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ স্নেহময় চক্রবর্তী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অবসরপ্রাপ্ত প্রিন্সিপ্যাল অধ্যাপক ড. ধনঞ্জয় গণচৌধুরি। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ডাঃ শঙ্কর রায়, দীপক কুমার দেব প্রমুখ। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতী রঞ্জু রায় তাঁর ভাষণে বলেন, বিদ্যাভারতীর বিশিষ্ট কর্মকর্তা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক প্রতিভার বিকাশ ঘটানো এবং শৈশব থেকেই তাদের মধ্যে অন্বেষণ ও আবিষ্কারের প্রবৃত্তি জাগ্রত করাই এই মেলার লক্ষ্য।

প্রাক্ প্রাথমিক ও প্রাথমিক দু'টি বিভাগে প্রদর্শিত মডেলগুলির গুণাগুণ বিচার করেন অবসরপ্রাপ্ত বিদ্যালয় পরিদর্শক স্বপন দেব, বিশিষ্ট বিজ্ঞান শিক্ষক বিকাশ মহন্ত ও সঞ্জিত ঘোষ। গুণাগুণের বিচারে প্রাক্ প্রাথমিক বিভাগে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারি টিম-লিডারদের নাম হলো যথাক্রমে শ্রীহিতা মল্ল, দেবাঞ্জন দে ও সমৃদ্ধি রায়বর্মন এবং প্রাথমিক বিভাগে যথাক্রমে শিবজ্যোতি দত্ত, অহনা দত্ত ও দেবলীনা আচার্য।

বিদ্যালয়ের আসন্ন বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বিজয়ী প্রতিটি টিমের সকল সদস্য-সদস্যাকে ও এই মেলায় অংশগ্রহণকারী সমস্ত ছাত্রছাত্রীকে পুরস্কৃত করা হবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ত্রিপুরেশ্বরী শিশু মন্দির একটি আদর্শ শিশুবাটিকা। খেলাধুলা ও বিভিন্ন আকর্ষণীয় শিক্ষা উপকরণের মাধ্যমে শিশুদের শিক্ষাদানের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলিও সেদিন বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা প্রদর্শিত হয়। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এই ধরনের উদ্যোগে সবাই সন্তোষ প্রকাশ করেন।

বঙ্গীয় নব উন্মেষ প্রাথমিক শিক্ষক সঙ্ঘের রাজ্যকমিটি গঠন

গত ২৬ জুন বঙ্গীয় নব উন্মেষ প্রাথমিক শিক্ষক সঙ্ঘের (অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘ দ্বারা অনুমোদিত) উদ্যোগে মানিকতলার কল্যাণ ভবনে একদিনের রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের শুভ সূচনা করেন অজিত বিশ্বাস। উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল

ভারতীয় সহ প্রচারক প্রমুখ অদ্বৈত চরণ দত্ত, সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক দীনেশ চন্দ্র সাহা, সভাপতি সোমেন দাস, সংগঠন সম্পাদক আলোক চট্টোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. স্বরূপ প্রসাদ ঘোষ। তিনি সম্মেলনে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষকদের বিবিধ সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। বৈঠকে রাজ্য কমিটি গঠিত হয় : সংরক্ষক— দীনেশ চন্দ্র সাহা, সভাপতি— সোমেন দাস, সহ-সভাপতি— ১। সদানন্দ গোস্বামী (দক্ষিবঙ্গ), ২। নারায়ণ চন্দ্র সরকার (উত্তরবঙ্গ), সাধারণ সম্পাদক— কানুপ্রিয় দাস, যুগ্ম সম্পাদক— ১। পার্থ গাঙ্গুলি (দক্ষিণবঙ্গ) ২। সুব্রত সরকার (উত্তরবঙ্গ), কোষাধ্যক্ষ— সুজিত মাল। এছাড়া প্রতিটি জেলা থেকে ১ জন করে শিক্ষককে জেলা কমিটির প্রতিনিধি হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

আবেদন

নাম : সৌম্যদীপ দাস, বয়স : ৯ বছর
পিতা : জয়শঙ্কর দাস,
গ্রাম : কলিগ্রাম, থানা : চাঁচল
জেলা : মালদা

ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত শিশুটি বর্তমানে কলকাতা টাটা হসপিটালে চিকিৎসাধীন। জেনারেল ওয়ার্ড, বেড নং-৫। চিকিৎসার জন্য প্রায় ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) টাকা ব্যয় হবে। শিশুটির চিকিৎসার জন্য সহৃদয় মানুষদের কাছে সাধ্যানুসারে সহায়তার আবেদন জানানো হচ্ছে। আপনার মূল্যবান সাহায্য শিশুটিকে নব জীবন দান করবে।

অর্থ সাহায্য পাঠান ঃ
NAME : JAYSANKAR DAS
STAT BANK OF INDIA
CHANCHAL BRANCH
AC NO.-30965131499
IFSC CODE-SBIN0002037

যোগাযোগ ঃ
8001065790 (ছোটন)
রেণুবালা ফার্মেসি,
কলিগ্রাম, মালদা

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বিশেষভবে অনুরোধ জানানো হচ্ছে যে, সরাসরি ব্যাঙ্ক মারফৎ বা মণিঅর্ডার যোগে স্বস্তিকায় টাকা পাঠালে সেই টাকা কী বাবদ পাঠালেন তা সঙ্গে সঙ্গে স্বস্তিকা দপ্তরকে জানান। গ্রাহকদের টাকা পাঠালে তাঁদের সম্পূর্ণ নাম ও ঠিকানা (ফোন নং-সহ) পাঠাতে হবে। অন্যথায় নাম না জানার কারণে আপনাদের পাঠানো টাকার কোনো রসিদ কাটা আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। যার ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নতুন গ্রাহকের টাকা পাঠানো সত্ত্বেও যেমন পত্রিকা পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না, তেমনই বকেয়া টাকার কারণে কারও কারও পত্রিকা সরবরাহ বন্ধ করে দিতে হচ্ছে। এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতির হাত থেকে বাঁচতে আপনাদের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

ইতিমধ্যে আপনি যদি ব্যাঙ্ক মারফৎ স্বস্তিকাতে কোনো টাকা পাঠিয়ে থাকেন তাহলে কবে পাঠিয়েছেন, কত টাকা পাঠিয়েছেন এবং কি বাবদ পাঠিয়েছেন অনুগ্রহ করে সত্বর আমাদের জানান। ব্যাঙ্ক মারফৎ টাকা পাঠালে ব্যাঙ্ক যে রসিদ আপনাকে দেয় সেই রসিদের জেরক্স কপিটা আমাদের পাঠালে ভালো হয়।

— ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

শোকসংবাদ

গত ২৫ জুন বর্ধমান জেলার মেমারীর ইলামপুর নিবাসী কানাইলাল মাজি পরলোকগমন করেন। তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শুভানুধ্যায়ী এবং স্বস্তিকা পত্রিকার একনিষ্ঠ পাঠক ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৩ পুত্র ও পুত্রবধূ, ১ কন্যা-জামাতা ও নাতি-নাতনি-সহ বহু গুণমুগ্ধ বন্ধুবান্ধব রেখে গেছেন।

* * *

উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রসেবিকা সমিতির প্রচারিকা জয়া ভট্টাচার্যের মাতৃদেবী রেণুকা ভট্টাচার্য গত ২৫ জুন উত্তর দিনাজপুর জেলার

রায়গঞ্জ শহরে রমেন্দ্রপল্লীস্থিত বাসভবনে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর। তিনি বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ-সহ সব হিন্দু সংগঠনের শুভানুধ্যায়ী ছিলেন। রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির প্রচার ও বিস্তারে তাঁর ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাঁরই প্রেরণায় তাঁর চতুর্থ কন্যা জয়া ভট্টাচার্য সমিতির প্রচারিকার জীবন স্বীকার করেছেন। তিনি ৩ পুত্র, ৫ কন্যা ও নাতি-নাতনি-সহ বহু গুণমুগ্ধ বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন রেখে গেছেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কলকাতা মহানগরের অন্তর্গত শ্যামাপ্রসাদ নগরের প্রাক্তন সহ নগর কার্যবাহ জগদানন্দ ভট্টাচার্য দীর্ঘ চার বৎসর কোমায় আচ্ছন্ন থাকার পর গত ৬ জুলাই ৮২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তিনি ১ পুত্র ও ২ কন্যাকে রেখে গেছেন। তাঁদের পরিবার ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর কুষ্টিয়া জেলা থেকে অসমের শিলচরে বসবাস করতে থাকেন। তিনি পঞ্চম শ্রেণীতে পাঠরত অবস্থায় সঙ্ঘে আসেন। ১৯৫৮ সালে তিনি কলকাতায় আসেন। তিনি আজীবন সঙ্ঘের বিভিন্ন দায়িত্ব-সহ বিবেকানন্দ শিলা স্মারক সমিতিতে কাজ করে গেছেন।

থাকে যদি
ডাটা
জমে যায় রান্নাটা
DUTA
SPICE POWDER & PAPAD
কেনার সময় অবশ্যই
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুকমী) প্রাইভেট লিমিটেড
নাম দেখে তবেই কিনবেন
TURMERIC POWDER
CUMIN POWDER
CORIANDER POWDER
RED CHILLI POWDER
Krishna Chandra Dutta (Cookme) Pvt. Ltd.
Regd. Office : 207, Maharshi Debendra Road, Kolkata - 700007
Contact : (M) 98366-72200 / (033) 2259-1796/5548
Email : dutaspice@gmail.com | Website : www.dutaspices.com

সংস্কার ভারতীর প্রয়াস
বাংলা নাট্যসঙ্গীতের ইতিহাসের খোঁজ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ 'ধনধান্য পুষ্পভরা', কিংবা 'আমার সাধ না মিটিল, আশা না পুরিল', অথবা 'জুড়াইতে চাই— কোথায় জুড়াই' এমনই বহুল প্রচলিত গানগুলির উৎস কোথায়? জানলে সত্যিই অবাক হতে হয়। কারণ এই বিখ্যাত গানগুলি রচিত হয়েছিল বাংলা নাটকের গান হিসাবে। সম্প্রতি সংস্কার ভারতী সিউড়ি শাখা আয়োজিত নাট্য উৎসবে বাংলা নাটকের আদিপর্ব থেকে বর্তমানে সময়কালের মধ্যে বিখ্যাত নাটকে ব্যবহৃত গান নিয়ে একটি গবেষণামূলক গীতিআলেখ্য 'মঞ্চগান' পরিবেশিত হলো।

নাট্য উৎসবে ভরত কুণ্ডুকে বরণ করে নেওয়া হচ্ছে।

বাঙালির থিয়েটারে প্রথম গানের ব্যবহার করেছিলেন রুশ দেশীয় নাট্যপ্রেমিক লেবেডেথ। দিনটা ছিল ২৭ নভেম্বর ১৭৯৫। একটি ইংরাজি নাটক দ্য ডিসগাইজের বাংলা রূপান্তর 'কাল্পনিক সংবদল' নাটক। তিনি নিজে গান লিখতে পারতেন না, তাই শরণাপন্ন হয়েছিলেন কবি ভারতচন্দ্র রায়ের। কবি লিখলেন— 'গুণ সাগর নাগর রায় নগর দেখিয়া যায়'। ১৮৩৫-এ ভারতচন্দ্র তাঁর নিজের 'বিদ্যাসুন্দর' নাটকের জন্য গান রচনা করলেন— 'কি বলিলি মালিনী ফিরে ফিরে বল'।

পরবর্তী সময়ে ওড়িশার জাজপুর থেকে ভাগ্য অন্বেষণে কলকাতায় আসা। গোপাল উড়ে সহজ বাংলা ভাষায় বিদ্যাসুন্দরের গান রচনা করলেন— 'ওই দেখা যায় বাড়ি আমার, চারদিকে মালঞ্চ বেড়া।'

গত ২৬ জুন বিকাশ ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় নাটকের গান আলেখ্যটি পরিবেশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই সংস্কার ভারতীর শিল্পীরা একের পর এক বিখ্যাত গান উপহার দিয়েছে আপন মুন্সীয়ানায়।

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বহু ধ্রুপদী উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছেন গিরিশ ঘোষ, অমৃতলাল বসুরা। স্টার থিয়েটারে 'মৃণালিনী', 'রাজসিংহ' 'কপালকুণ্ডলা'র মতো নাটক দাপিয়ে অভিনয়ের মাধ্যমে। ১৮৭৩-এ বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা 'কপালকুণ্ডলা' নাটকের গানটি— 'ভালবাসা ভুলি কেমনে' শ্রোতাদের মন ছুঁয়ে যায়। অনুষ্ঠান চলাকালীনই ভাষ্যপাঠের তথ্য অনুযায়ী শোনা গেল— ১৮৮১ সালে বাংলা রঙ্গালয়ে 'মাধবী কঙ্কন' নাটকটি আলোড়ন ফেলে দেয়। এই নাটকে অতুলকৃষ্ণ মিত্রের লেখা সহজ, প্রচলিত গানটি পরিবেশিত হতেই চমকে ওঠেন অনেকেই, গানটি হলো— 'আমার সাধ না মিটিল, আশা না পুরিল, সকলই ফুরায়ে যায় মা'।

এখানেই শেষ নয়, সিউড়ির রামকৃষ্ণ সভাগৃহের পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহের দর্শকদের কাছে এই অনুষ্ঠান আরও অনেক অজানা তথ্যের জানান দিল। বাংলা নাট্যসঙ্গীতে মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষের অবদান অপরিসীম। ১৮৮৫-তে 'বুদ্ধচরিত' নাটকে তিনি যে গানটি লিখেছিলেন সেটি আরও একটি বহুল প্রচারিত গান। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অত্যন্ত প্রিয় সেই গানটি— 'জুড়াইতে চাই— কোথায় জুড়াই? কোথা হতে আসি, কোথা ভেসে যাই'। পরিবেশনের মাধ্যমে দর্শকদের আপ্লুত করে তোলে।

তবে 'ধন ধন্য পুষ্পভরা' গানটি ১৯০৯ সালে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তার বিখ্যাত নাটক 'সাজাহান'-এর জন্য লিখেছিলেন সেই তথ্য জানতে পেরে অনেক শ্রোতাই আনন্দিত হন। এছাড়াও গীতিনাটক লেখক, নাট্যকার ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'বাংলার মসনদ' নাটকের গান, বাংলার ন্যাশানাল থিয়েটারের অন্যতম রূপকার অমৃতলাল বসুর লেখা 'খাস দখল' নাটকের গান উল্লেখযোগ্য। বাংলা নাটককে পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ঘেরাটোপ থেকে বার করে— তাকে আধুনিক করে তুলেছিলেন শিশির কুমার ভাদুড়ি। তিনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কাছে নাটক চাইলেন। রবীন্দ্রনাথ তাকে ১৯২৫-এ লেখা 'চিরকুমার সভা' ও ১৯২৭-এ লেখা 'শেষরক্ষা' নাটকদুটি অভিনয় করার অনুমতি দেন। চিরকুমার সভা নাটকের সেই বহুল প্রচলিত গান— 'আমার জ্বলেনি আলো অন্ধকারে' পরিবেশিত হলো সমবেত কণ্ঠে।

কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর সমসাময়িক বহু নাট্যকার, পরিচালকের অনুরোধে নাটকের জন্য গান লিখে দিয়েছিলেন। মন্মথ রায়ের সঙ্গীতবহুল 'কারাগার' নাটকের ১০টি গান লিখেছেন নজরুল, সুরারোপও করেন। 'কারাগার' নাটকের রিহার্সাল চলার সময় বৃটিশ পুলিশ অতর্কিতে তাকে রাজদ্রোহের অপরাধে গ্রেপ্তার করে। ১৯৩১-এর ৪ঠা ফেব্রুয়ারি 'কারাগার' নাটক নিষিদ্ধ হয়। নজরুল এই নাটকের গানের মাধ্যমে দেশাত্মবোধের মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন। অনুষ্ঠানের সর্বশেষ নিবেদন কারাগার নাটকের গান— 'জাগো জাগো শঙ্খচক্র গদাপদ্মধারী'।

নাট্য উৎসবে উদ্বোধক রূপে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব স্বপন রায়, অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন বিভাগীয় বন আধিকারিক কল্যাণ রায়, সংস্কার ভারতীর সম্পাদক ভরত কুণ্ডু, মানস চক্রবর্তী। দ্বিতীয়ার্ধে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাটক 'ভীমবধ' ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায় অনুপ্রাণিত নাটক 'চাণক্য চন্দ্রগুপ্ত' মঞ্চস্থ হয়। ▌

শব্দরূপ-৭৯৬ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

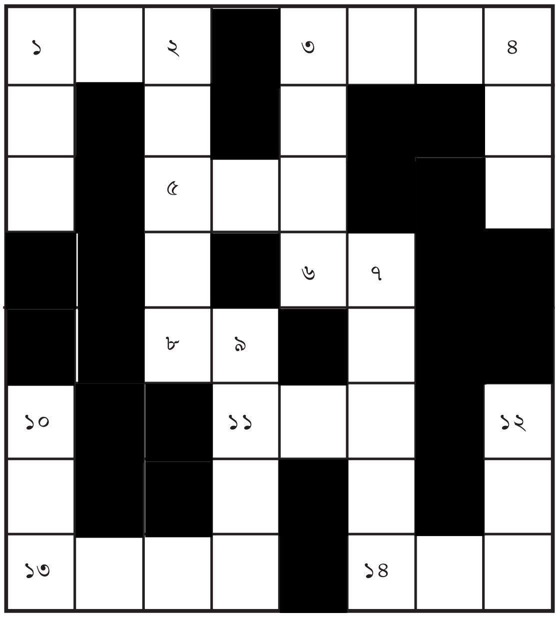

সূত্র :

পাশাপাশি : **১.** বৃক্ষাদি হতে নির্গত রস বা আঠা, **৩.** সমুদ্র, **৫.** হরিণবিশেষ (ডাল-ওয়ালা শিং), **৬.** ভীমের হাতে নিহত রাক্ষস বিশেষ, **৮.** কাব্যরচয়িতা, **১১.** নাস্তানাবুদ, নাজেহাল, **১৩.** কড়ি, **১৪.** ছোট্ট পাখি বিশেষ।

উপর-নীচ : **১.** কঠিন, দৃঢ়। (ব্যঙ্গে) মস্তিষ্কহীন, মূর্খ, **২.** যে শপথ করেছে জয়লাভ বা মৃত্যু পর্যন্ত যুদ্ধ করবে, **৩.** গুজব, লোকে যা রটায়, **৪.** দ্বিত্বে মাদলের বোল বা ধ্বনি, **৭.** নাসারন্ধ্র দিয়ে জল টেনে বারবার মুখের দ্বারা শীৎকারপূর্বক জলগ্রহণ করে নাসারন্ধ্র দিয়ে বিরেচন (একটি যোগবিধি), **৯.** গণেশ, বুদ্ধ, গরুড়, **১০.** শিব, তিন চক্ষু বলে এই নামে পরিচিত, **১২.** সঙ্গীতের রাগিনী বিশেষ।

সমাধান
শব্দরূপ-৭৯৩

		আ	কা	শ	প্র	দী	প
পা	ন	কু		কু			চ্য
তি		পা		নি	ক	ষ	
পা	ল	ং			র		হে
তি		চা			ম	ঙ্গ	লা
	হ	র	প		প		ফে
মা			র		র	ঙ্গি	লা
কু	টি	ল	স্ব	ভা	ব		

সঠিক উত্তরদাতা

বিজয় বসাক
বৈষ্ণবনগর, মালদা
সুশীল কয়াল
কলকাতা-৬

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

□ ৭৯৬ সংখ্যার সমাধান আগামী ৮ আগস্ট ২০১৬ সংখ্যায়

প্রেরণার পাথেয়

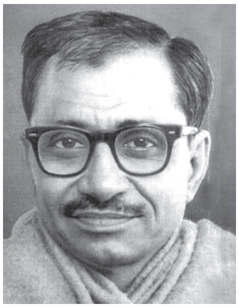

ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে কোনো সঙ্ঘর্ষ নেই। যদি সঙ্ঘর্ষ হয়ে থাকে তা বিকৃতির লক্ষণমাত্র। সমষ্টির হিতসাধনের জন্য ব্যক্তির স্বাধীনতায় শৃঙ্খল পরানোর প্রয়োজন নেই। বস্তুত স্বৈরাচারের মধ্যে ব্যক্তির বিকাশ হয় না, বিনাশ হয়। সমষ্টির সঙ্গে একত্মতায় ব্যক্তি পূর্ণ বিকশিত হবে পারে। ব্যক্তিই সমষ্টির পূর্ণতার মাধ্যম ও মাপদণ্ড। ব্যক্তি স্বাধীনতা ও সমাজহিতের মধ্যে কোনো বিরোধিতা নেই। গণতন্ত্র লোক-কর্তব্য নির্বাহের একটি উপায় মাত্র। উপকরণের প্রভাব-ক্ষমতা জনজীবনে রাষ্ট্রের প্রতি একত্মতা, দায়িত্ববোধের জ্ঞান ও অনুশাসনের ওপর নির্ভর করে। যদি নাগরিকদের মধ্যে এই সংস্কার না থাকে তাহলে গণতন্ত্র ব্যক্তি, শ্রেণী ও দলের স্বার্থসিদ্ধির মাধ্যমে পর্যবসিত হবে এবং বিকৃত হয়ে পড়বে।

জনমত সংস্কারের কাজ তিনিই করতে পারেন যিনি নাম-যশ আকাঙ্ক্ষার উপর উঠেছেন। ভারতে এর উদাহরণ ভুরিভুরি আছে। ভারতে এই সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারের হাত থেকে জনমত নির্মাণের মাধ্যম কেড়ে নেওয়া হয়েছে। জনমত সংস্কারের কাজ বীতরাগী, দ্বন্দ্বাতীত সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীকুলের হাতে রয়েছে। জনমত অনুসারে চলার কাজ সরকারের। সন্ন্যাসীকুল সদৈব ধর্মের তত্ত্ব অনুসারে, জনগণের ঐহিক ও আধ্যাত্মিক মুক্তির জন্য নিজের বাণী ও আচরণে জনমানসে সংস্কার নির্মাণ করে চলেছেন। তাদের ধর্মানুসারে জীবনযাত্রা নির্বাহ করার জন্য প্রেরণা দিয়ে চলেছেন।

(পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ব্যক্তি-দর্শন থেকে)

।। চিত্রকথা ।। বিক্রমাদিত্য ।। ২৯

স্বস্তিকা চিহ্ন এগারো হাজার বছরের পুরনো

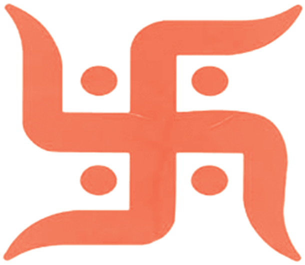

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ আর্যতত্ত্ব খারিজ হয়েছে আগেই। এবার জানা গেল ভারতীয়দের সুখসমৃদ্ধির প্রতীক হিসেবে পরিচিত স্বস্তিকা চিহ্নের বয়স এগারো হাজার বছর। অর্থাৎ আর্যদের কাল্পনিক আগমনের অনেক আগে থেকেই স্বস্তিকা চিহ্নের অস্তিত্ব এদেশে ছিল। এখান থেকেই সুখ ও সমৃদ্ধির এই প্রতীক মধ্যপ্রাচ্য ও পশ্চিমি দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের 'সন্ধি' নামক প্রকল্পের আওতায় আই আই টি খড়্গপুর-সহ দেশের বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব নিয়ে যে গবেষণা চলছে তাতেই প্রকাশ পেয়েছে একগুচ্ছ চমকপ্রদ তথ্য। গবেষক দলের সদস্য অধ্যাপক জয় সেন জানিয়েছেন, গবেষণায় হরপ্পা সভ্যতার আগেও স্বস্তিকা চিহ্নের অস্তিত্বের কথা জানা গেছে। তখন এটি সিলমোহরের আকারে ছিল। একই সময়ে বেদেও স্বস্তিকা চিহ্নের উল্লেখ থাকার কথা গবেষণায় উঠে এসেছে। তাঁর দাবি তথাকথিত আর্যসভ্যতার অনেক আগে থেকেই ঋকবেদ শ্রুতিরূপে ছিল। স্বস্তিকা চিহ্ন কীভাবে ভারত থেকে টারটার মঙ্গোলিয়া হয়ে কামচাটকা এবং আমেরিকায় পৌঁছয় তাও জানা গেছে গবেষণা থেকে। পরবর্তীকালে মায়া ও অ্যাজটাক সভ্যতাতেও স্বস্তিকা চিহ্নের বহুল ব্যবহার দেখা যায়। আমেরিকা থেকেই ধীরে ধীরে তা ফিনল্যান্ড, স্ক্যান্ডেনেভিয়া, বৃটিশ হাইল্যান্ড এবং ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে।

গোহত্যা রোধে হরিয়ানায় ২৪ ঘণ্টার হেল্পলাইন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ আশেপাশে কোথাও গোরু পাচার বা হত্যার ঘটনা ঘটলে সাধারণ মানুষ যাতে সরাসরি পুলিশকে খবর দিতে পারে তার জন্য হরিয়ানা পুলিশ ২৪ ঘণ্টার হেল্পলাইন চালু করল। এই নম্বরে ফোন করে খবর দিলে তা রিলে পদ্ধতির মাধ্যমে পুলিশের শীর্ষ কর্তাদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হবে। তারপর তারা উপদ্রুত অঞ্চলে বিশেষ বাহিনী পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন। হরিয়ানা রাজ্য পুলিশের যুগ্ম কমিশনার কে. পি. সিং জানিয়েছেন, গো-পাচার রুখতে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ব্যারিকেড গড়ে তোলা হবে। দীর্ঘদিন ধরে হরিয়ানায় গোহত্যা এবং পাচার একটি মূর্তিমান সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। গত বছর গোবংশ সংরক্ষণ এবং গোসংবর্ধন আইন করেও কোনো লাভ

হয়নি। তাই পুলিশ সাধারণ মানুষের সাহায্য চাইছে। যাতে পুলিশ সঠিক খবর পেয়ে সময়মতো অকুস্থলে পৌঁছতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, হরিয়ানায় শুধু প্রশাসনই নয়, নাগরিক সমাজও কিছু মানুষের এই কুপ্রবণতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি গোরক্ষক দলের স্বেচ্ছাসেবকেরা গোমাংস-সহ দুই ব্যক্তিকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন। তাদের পঞ্চগব্য সেবনের মতো প্রতীকী শাস্তিও দেওয়া হয়।

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট

২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৭০০ ০০৬

ঘোষণা

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট আনন্দের সহিত ঘোষণা করিতেছে যে, লেখাপড়া করিবার জন্য কৃতী ছাত্রছাত্রীদের বার্ষিক বৃত্তি ট্রাস্টের পক্ষ থেকে প্রদান করা হইবে। উপযুক্ত প্রমাণপত্র এবং সুপারিশসহ আবেদন গৃহীত হইবে। নিম্নলিখিত হারে বৃত্তি প্রদান করা হইবে

নবম ও দশম শ্রেণী বার্ষিক	১০০০.০০ টাকা
একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী বার্ষিক	১৪০০.০০ টাকা
কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় বার্ষিক	২০০০.০০ টাকা

আবেদনপত্র 'সম্পাদক, স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট'-কে করিতে হইবে।

১৮।০৭।২০১৬

সম্পাদক
স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট

চার্চের নির্দেশে বিবাহবিচ্ছেদ বেআইনি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ক্যাথলিক খৃষ্টানদের বিবাহবিচ্ছেদ সংক্রান্ত মামলার নিষ্পত্তি এতকাল চার্চ-পরিচালিত ট্রাইবুনালগুলিতে হোত। সাধারণ্যে যার পরিচিতি চার্চ কোর্ট হিসেবে। কিন্তু সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিয়েছে চার্চ কোর্টের কোনো আইনগত ভিত্তি নেই। এই আদালতের রায়ে বিবাহবিচ্ছিন্ন কেউ যদি পুনর্বার বিবাহ করেন তা হলে সেই বিবাহ আইনের চোখে অবৈধ বলে প্রতিপন্ন হবে। বেঙ্গালুরুর ক্যাথলিক আইনজীবী ক্লারেন্স পেইসের দাখিল করা একটি জনস্বার্থ মামলার শুনানির সময় বিচারপতি টি এস ঠাকুর এবং ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় এই রায় দেন।

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57
18 July - 2016 - Rs. 10.00,